দাম : বারো টাকা

# স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন নতুন রাজনীতির সূচনা করেছে— পৃঃ ৫

নির্বাচন পরবর্তী হিংসার স্বরূপ জানলে আপনিও স্তম্ভিত হয়ে যাবেন— পৃঃ ৭

৭৩ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ২৮ জুন, ২০২১।। ১৩ আষাঢ় - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

## নির্বাচন পরবর্তী হিংসার আড়ালে রাজ্য জুড়ে নির্বিচারে মৌলবাদী আক্রমণ

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৮ জুন - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩**

**দাম : ১২ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


## সূচিপত্র


**সম্পাদকীয়** ▯ ৪

**পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন নতুন রাজনীতির সূচনা করেছে**
▯ পুলকনারায়ণ ধর ▯ ৫

**নির্বাচন পরবর্তী হিংসার স্বরূপ জানলে আপনিও স্তম্ভিত হয়ে যাবেন** ▯ কল্যাণ গৌতম ▯ ৭

**ইসলামি জেহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে**
▯ কৌশিক দাস ▯ ৯

**বিজেপি ক্ষমতা দখল করতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়ার পথ প্রসস্থ হলো**
▯ মোহিত রায় ▯ ১১

**দিশি পত্রিকায় মোদীবধ, মুখ ঢাকো লজ্জায়**
▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ১৩

**অত্যাচার করে স্বয়ংসেবকদের দমিয়ে রাখা যায় না**
▯ জয়ন্ত পাল ▯ ১৭

**চিঠিপত্র** ▯ ১৯

**কীর্তনীয়া কৃষ্ণভামিনী**
▯ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ▯ ২১

*With Best Compliments*
*from :-*

# A
# Well Wisher

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

**AXIS Bank Ltd.**

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-700 071**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## বাঘে-গোরুতে একঘাটে

স্বাধীনতার দীর্ঘ কয়েক দশক পর ভারতবর্ষ প্রকৃত অর্থেই এক দিশা পাইয়াছে। সারা বিশ্ব এখন ভারতকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে শুরু করিয়াছে। ভারতবাসীও তাহাদের স্বাভিমান ফিরিয়া পাইতে শুরু করিয়াছে। দেশে জাতীয়তাবোধের আবহ রচিত হইয়াছে। বিশ্ব দরবারে ভারতের মাথা উঁচু হইয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতই বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রমাদ গনিতে শুরু করিয়াছে। তাহারা নানা ভাবে ভারতের বর্তমান নেতৃত্বকে অপদস্থ করিবার প্রচেষ্টা চালাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, ভারতে অভ্যন্তরেই বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাহাদের প্রসাদপুষ্ট তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও ভারতবর্ষের এই নবোত্থান সহ্য করিতে পারিতেছে না। নিরন্তর তাহারা ইহার বিরুদ্ধে সচেষ্ট রহিয়াছে। ইহারা শুধুমাত্র সরকার বিরোধী নয়, রাষ্ট্রবিরোধী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বস্তুত ভারতে প্রকৃত জাতীয়তাবোধের জাগরণ কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা কোনোদিনই চায়নি। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে তাহাদের দীর্ঘ শাসনকালে সর্বদিক হইতে শুধু অবক্ষয়ই হইয়াছে। সব চাইতে বড়ো কথা হইল, বর্তমান প্রজন্মকে দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসনে বাঙ্গালি হিন্দু স্বাভিমান শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ তোষণের রাজনীতির ফলে জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্ত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যখন জাতীয়তাবোধের আবহ তৈরি হইয়াছে, মানুষ নব উদ্যমে জাগিয়া উঠিয়াছে, তখন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট-সহ বিরোধী দলগুলি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে রুখিতে লিখিত-অলিখিত জোট করিয়া একত্র হইয়াছে। মোদী বিরোধিতায় তাহার মতাদর্শ ভুলিয়া একত্রে আসিয়াছে। এক কথায় 'বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভারতীয় জনতা পার্টির অগ্রগতিকে রুখিতে জেহাদি শক্তিকে সঙ্গে লইয়াছে। একজন কমিউনিস্ট নেতা স্বীকার করিয়াছেন যে তাহারা বিজেপির অগ্রগতি রুখিতে তৃণমূলকে জয়যুক্ত করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বিজেপির ভয়ে তাহারা জিহাদি শক্তির হাত ধরিয়াছে।

বিধানসভা নির্বাচনে একটি কথা পরিষ্কার হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের বহু হিন্দু এখনও স্বাভিমানশূন্য রহিয়াছেন। তাহারা জেহাদি শক্তির মদতদাতা তৃণমূলের পক্ষেই রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে শাসকদলের মদতে জেহাদিদের অত্যাচারেও তাহারা নীরব রহিয়াছে। জেহাদি শক্তির আগ্রাসী এই কার্যকলাপে স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থার কথা মনে করিয়া দিতেছে, তবু স্বাভিমানশূন্য হিন্দুদের হেলদোল নাই। অন্যায়, অবিচার, অপমান তাহারা কাপুরুষের মতো সহ্য করিতেছে। কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা ইহাই চাহিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ইহাদের কবল হইতে না বাহির হইতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বাংলাদেশ হইতে আর বিলম্ব নাই।

## সুভাষিতম্

**গুণা গুণজ্ঞেষু গুণা ভবন্তি**
**তে নির্গুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ।**
**সুস্বাদুতোষাঃ প্রভবন্তি নদ্যঃ**
**সমুদ্রমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ।।**

*গুণ গুণবান ব্যক্তির মধ্যে গুণ হিসেবে থাকে। কিন্তু গুণহীন ব্যক্তির মধ্যে তা দোষে পরিণত হয়। নদীর সুপেয় জলই প্রবাহিত হয় কিন্তু সমুদ্রে পৌঁছনোর পর তা আর পানযোগ্য থাকে না।*

# পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচন নতুন রাজনীতির সূচনা করেছে

**পুলকনারায়ণ ধর**

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ২০২১-এর নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা করেছে। শুধুমাত্র শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিকোণ বা ভোটে জয় লাভের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অবশ্যই কোনও পরিবর্তন ঘটেছে বলা যাবে না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয়বারের জন্যও তার ক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। ২০১১ সালের পরিবর্তন ছিল এক বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন। এই সরকার পরিবর্তনের নিরিখে তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠন করার কোনও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই নির্বাচন ও তার ফল যে পরিবর্তনের সূচনা করেছে তা সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন। এতকাল পর্যন্ত রাজনীতি চলছিল বামপন্থী ও অবামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ছক অনুসরণ করে। তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনও নিরিখেই বামপন্থী বলা যাবে না। বামপন্থাকে পরাজিত করেই তার উত্থান। অবশ্য বলা যায়— তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কোনো কোনো কাজ বা তার কর্মপদ্ধতি বামপন্থীদেরই অনুকরণ। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে গরিব মানুষের কাছে বামপন্থা আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। ২০২১-এর নির্বাচনে বিধানসভায় অঙ্কের হিসাবেও বামেরা ভোকাট্টা। ২৯৪টি (বাস্তবে ২৯২টি) আসনের একটিতেও তারা জয়ী হতে পারেনি। প্রায় সর্বত্রই তারা তৃতীয় স্থানে নির্বাসিত। বহু গুরুত্বপূর্ণ আসনে তাদের প্রার্থীদের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রথম থেকেই এবারের নির্বাচন ছিল দক্ষিণপন্থী বনাম দক্ষিণপন্থীর। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কে কেন্দ্র করেই নির্বাচনী রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে। একটা রব উঠেছিল বিজেপি এবার সরকার গঠন করবে। সরকার গঠনের অঙ্ক থেকে শেষ পর্যন্ত বহু দূরের অঙ্কে (৭৭) বিজেপির যাত্রা থেমে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল আসনে (২১৪) জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়। নন্দীগ্রামের একদা তাঁরই সহযোদ্ধা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তিনি উনিশ হাজারের বেশ কিছু ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তাঁর এই পরাজয়ের গ্লানিকে তাঁর দলের বিপুল জয় অনেকটা ম্লান করে দিলেও তাঁর পরাজয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৮৪ সালে সংসদের নির্বাচনের কাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি মাত্র একবার সিপিএমের অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে ১৯৮৯ সালে পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এই পরাজয় তিনি কোনোদিনও ভুলতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ঘটনা সাধারণ মানুষ ভুলবে না। প্রমাণিত হলো তিনি অপরাজেয় নন। পরাজিত হয়েও তিনি কালবিলম্ব না করে রাজ্যপালের কাছে গিয়ে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি পেশ করেছেন এবং সাংবিধানিক নিয়ম মান্য করেই তিনি আগামী ৬ মাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ঘটনা অভূতপূর্ব। ৬ মাস পরে বা তার আগেই হয়তো তিনি বিধান সভায় কোনো উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর হৃত আসন উদ্ধার করে ফিরে আসবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস এই নতুন ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল।

**বিধানসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে বিজেপির প্রতিনিধিরা থাকবেন। নীতি নির্ধারণ বা সরকারের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তাদের সংসদীয় ভূমিকা থাকবে। একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির আধিপত্য সংসদের বাইরের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এতবড়ো সুযোগ গত ১০ বছর অন্য কোনও দল পায়নি যা ৩ থেকে ৭৭টি আসন বিজেপি জয়লাভ করেছে।**

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান নতুন নয়। কংগ্রেসকে হটাবার জন্য ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে উজ্জীবিত রাজনীতি করার দৃষ্টান্ত প্রথম স্থাপন করেন সিপিএম নেতা জ্যোতি বসু। পরবর্তীতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি মন্ত্রীসভার রেলমন্ত্রী (পরে কয়লা মন্ত্রী) হয়েছিলেন। বিধান সভায় সম্প্রতি বিজেপির ৩ জন সদস্য ছিলেন। বর্তমানে এই ৩ সদস্যের সংখ্যা বেড়ে হলো ৭৭ জন। সরকার গঠন করতে না পারলেও এক লফে ৩ থেকে ৭৭ জন সদস্যের আসন লাভ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বামমার্গী রাজনীতির মাটি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি প্রস্তর ফলক। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় এই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি বা বামপন্থীদের আসন শূন্য। অথচ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই/সিপিএম) পার্টির ১০০তম জন্ম দিবস পালন করেছে গত বছর।

বিজেপির বিধানসভায় আসন লাভকে দুটি দিক থেকে বিচার করা যায়। সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ সকল বিজেপি নেতারা বারবার তাঁদের প্রচারে বিজেপির ক্ষমতা লাভের নিশ্চয়তার কথা বলে বিপুল আশার সঞ্চার করেছিলেন। সত্যিই বিজেপি ক্ষমতা লাভ করতে পারে এইরকম একটা আশার সৃষ্টি হয়েছিল ভাষ্যকারদের মধ্যেও। তৃণমূলের দলে ছোটো বড়ো নেতা পদত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। এতেই একটা জয়ের নিশানা চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু ভোটের ফলাফলে তা প্রতিফলিত হলো না। ফলে সৃষ্টি হলো এক চরম হতাশা। এবং এই নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনার নিরিখে বিজেপিকে ভয়ংকর ভাবে একটি পরাজিত দলে বলে চিহ্নিত হতে হলো। প্রচার হলো পশ্চিমবঙ্গে সেকুলারইজমের জয়

হয়েছে। প্রগতিশীলতা 'ফ্যাসিবাদ'কে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। বিজেপির কোন কাজটি 'সাম্প্রদায়িক' এবং কোন কাজটি 'ফ্যাসিবাদী' তা অবশ্য কেউ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন না। এটা অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিজেপির পরজয়কে সহজ সরল ভাবে বিচার করা হয়। এই ভাবে কোনও ঘটনার বিচার করতে বেশি চিন্তা বা বুদ্ধির দরকার হয় না, বলে দিলেই হলো। বিধানসভার নির্বাচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রচ্ছন্ন ভাবে মুসলমান ভোটদাতাদের যে উৎসাহিত করা হয়েছিল তার ফল প্রত্যক্ষভাবে সম্প্রদায়গত ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে ভোটের বাক্সে। বিজেপি যে মুসলমানদের একটি ভোটও পাবে না সে ব্যাপারে কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই ভোটে বাম ও কংগ্রেস এই দুই ঘোষিত সেকুলার দল দুটিও পায়নি। এমনকী নবগঠিত আইএসএফ-এর দলও নয়। ভয়ংকর গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ফলে ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট পেয়ে একটি বিধায়ক পদ সিদ্দিকির আই এস এফ দল লাভ করেছে। এমনকী অধীর চৌধুরীর শক্ত দুর্গ মুর্শিদাবাদেও কংগ্রেস ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। প্রচারের ঢেউয়ে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের অস্তিত্বের সংকট আশঙ্কা করে সাম্প্রদায়িক ভাবেই শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি, তারা এতদিনের বন্ধু কংগ্রেস ও সিপিএম-এর বিরুদ্ধেও ভোট দিয়েছে। এদের কাছে গণতন্ত্র বা সেরকুলারিজম শব্দের কোনও অর্থ বা তাৎপর্য নেই। সিপিএম এবং কংগ্রেসের পরাজয়টা 'সেকুলারিজমের কোনো জয় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

১৯৭৭ সালেও এই ভাবেই ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ঘটেছিল। আবার এই মুসলমান ভোট পেয়েই তিনি ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন। সুতরাং এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে আমাদের গণতন্ত্রে বা ভোটতন্ত্র ক্রমশ সাম্প্রদায়িক স্বার্থই নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করছে। এই কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ভোট, মতুয়া ভোট, খ্রিস্টান ভোট, অবাঙ্গালি ভোট এবং (হিন্দুদের) জাতপাতের ভোটের কথা ভেবেই নির্বাচনে প্রার্থী নির্ধারণ করে। এদের সকলেরই হাতে থাকে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজমের ফেস্টুন। সংবিধানও আবার জাতপাতের বিচারে অনেক আসন পূর্ব নির্ধারণ করে রেখেছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের নেতারাও ইদানীং মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে হনুমান পূজা, গণেশ পূজা, কেতু পূজা, মা শীতলা পূজায় হত্যে দিয়ে থাকেন। সেকুলারিজমের প্রতি এদের বিশ্বাস শুধু ভোট বাক্সের জন্যই। এই কারণেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দেশ থেকে তিরোহিত হয়নি। সেকুলারিজমের অর্থ সংকীর্ণ ও নির্বাচন কেন্দ্রিক হতে হতে বর্তমানে মুসলমান ভোট দাতাদের যে কোনো দাবি ও বক্তব্যে সায় দেওয়াকেই বোঝায়। যে কোনো বিষয়ে মুসলমানদের সঙ্গে না থাকলেই সাম্প্রদায়িকতা। এমনকী দলবদ্ধ ভাবে বেআইনি কর্মকাণ্ডকেও প্রশাসন দেখেও দেখে না। সুতরাং এটা বাড়তে বাড়তে হিন্দুদের মধ্যেও যে নিরাপত্তার সংশয় উপস্থিত হয়েছে সে ব্যাপারে বিজেপি ছাড়া আর কোনও দলই মানতে চাইছে না। হিন্দুদের একটি বড়ো অংশ এই সত্যটি অনুভব করেই ক্রমশ বিজেপির প্রতি অনুকূল হয়ে উঠছে। এবং বৃহৎ হিন্দু অধ্যুষিত দেশে বিজেপি এই জনগোষ্ঠীর রক্ষাকর্তা হয়ে উঠছে। এটাই বাস্তব। পশ্চিমবঙ্গেও মার্কসবাদীরা বিপুল মুসলমান ভোট না পেয়েই ২০১১ সালে দুর্বল হয়ে যায়। এবারের নির্বাচনেও তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একই কারণে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০২১-এর বিধানসভার নির্বাচন। বিজেপিই এই নির্বাচনের বড়ো চমক এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতির ইঙ্গিতবাহী রাজনৈতিক দল হিসাবে উঠে এসেছে।

২০১১-এর লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন লাভ করে সারাদেশে বিজেপি আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। সামান্য দু'এক হাজার ভোটের ব্যবধনে আরও ২টি আসন তার হাত থেকে ফস্কে যায়। বিধানসভার কেন্দ্র বিচারে প্রায় ১২৫টি কেন্দ্রে বা আসনে সে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে থাকে। এই হলো তার জয়যাত্রার বড়ো সূচনা। ২০২১-এর বিধানসভার নির্বাচন বিজেপিকে সরকার গঠনের জায়গা থেকে অনেক দূরে রাখলেও রাজনৈতিক বিচারে ক্ষমতাবান করেছে।

সামান্য কয়েকটি সূত্র থেকে বিজেপির অবস্থানটা দেখা যেতে পারে। মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হিসাবে : বিজেপি ৩৮.১ শতাংশ/ তৃণমূল ৪৭.৯ শতাংশ।

মোট ভোট : বিজেপি ২২, ৮৫০, ৭১০ (২ কোটি ২৮ লক্ষ ৮৫০ হাজার ৭১০) তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ২৮, ৭৩৫, ৩১০ (২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩৫ হাজার, ৪২০)। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির থেকে ৫,৮৮৪,৭১০ ভোটে অর্থাৎ মাত্র ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি ভোটে এগিয়ে আছে। শতকরা হিসেবে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২.৯ শতাংশ এবং সিপিআইএম বা বামেরা পেয়েছে ৪.৭ শতাংশ ভোট। উল্লেখযোগ্য তৃণমূল অন্তত ১০টি আসনে ১ হাজার থেকে ৩৮০০ ভোটে জয়ী হয়েছে। বিজেপিও বেশ কয়েকটি আসনে সামান্য ভোটে জয়ী হয়েছে। এর মধ্যে আছে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়। সুতরাং ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে থাকলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিকাঠামোটি বিজেপি বেশ পাকাপোক্ত ভাবে ধরে ফেলেছে। বিধানসভায় শাসক এবং বিরোধী বিজেপি মেরুকরণের রাজনৈতিক সমীকরণ ঘটিয়ে ফেলেছে। বিধানসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলিতে বিজেপির প্রতিনিধিরা থাকবেন। নীতি নির্ধারণ বা সরকারের বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তাদের সংসদীয় ভূমিকা থাকবে। একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির আধিপত্য সংসদের বাইরের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এতবড়ো সুযোগ গত ১০ বছর অন্য কোনও দল পায়নি যা ৩ থেকে ৭৭টি আসন বিজেপি জয়লাভ করেছে।

এখনও পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মেরুকরণ ঘটেনি। যেটা ঘটল তা হচ্ছে দলীয় মেরুকরণ। মুসলমান সম্প্রদায় ভোটদানের ক্ষেত্রে এককাট্টা হলেও হিন্দু সম্প্রদায় এককাট্টা হয়ে হিন্দুত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে অভ্যস্ত হয়নি। অন্যদিকে অসমে ৪০.৩ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা হলেও বিজেপি পরপর ২ বার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করেছে। হিন্দুদের ভোট অসমে অস্তিত্বের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও মূলত ধর্মীয় বিভাজনের কাজ দুই রাজ্যের মাটিতেই প্রোথিত। দুই রাজ্যই বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া। দুই রাজ্যেই বাংলাদেশ থেকে আগত অনাগরিকদের অনুপ্রবেশ একটি বড়ো সমস্যা। ১৯৮৫ সালে অসমে রাজীব গান্ধী Assam Accord করে তা কিছুটা সামাল দিলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা নিজেদের মতন করেই বিজেপিকে বেছে নিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গ দূরে নেই। সেকুলারিজম-এর প্রচার কতদিন তা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের জগতে ধর্মনিরপেক্ষ খুচরো দল ও কতিপয় কবি সাহিত্যিকের আসন শূন্য হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির ৭৭টি আসন ও ২ কোটি ২৮ লক্ষের বেশি ভোটের জয়কে উপেক্ষা করার কোন কারণ নেই। কিন্তু ৭৭ জন বিজেপি বিধায়ক কোনও কর্মসূচি ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ভবিষ্যতে কাজ করবেন তার ওপর এই নতুন রাজনৈতিক চিত্রের ভবিষ্যৎ চরিত্র নির্ভর করবে।

# নির্বাচন পরবর্তী হিংসার স্বরূপ জানলে আপনিও স্তম্ভিত হয়ে যাবেন

**কল্যাণ গৌতম**

'মহামৃত্যু' মানে কি জানেন? 'মহামৃত্যু' হলো 'আত্মবিস্মৃতি'। নিজেকে পুরোপুরি ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া, নিজের ধর্মের প্রতি নেমে আসা সহস্র আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়া, পরিবারকে চোখের সামনে বিধর্মীদের কাছে ধর্ষিতা ও খুন হতে দেখেও চোখ বন্ধ করে 'ধর্মীয় সম্প্রীতি'র নামে 'সেকুলারিজম' জপ করার নামই হলো 'আত্মবিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এক চরম 'আত্মবিস্মৃত' ও 'আত্মধ্বংসী' জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়, তারা অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আরও আরও পশ্চিমে। দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশের বন্ধন থেকে মুক্তির দৌড়! জলছবিটির মতো নিজের গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে পলায়ন! মা-বোন-বউ-মেয়েকে মাংস-হাতড়ানো ভয়ংকর পশুর মুখে ফেলে রেখেই নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহাস মনে রাখবে! বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

**ফলপ্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গ আড়েবহরে এক সাম্প্রদায়িক কসাইখানায় পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোড়কে এক আগ্রাসী সম্প্রদায়ের সংঘটিত আক্রমণে দিশেহারা হয়েছিল সাধারণ মানুষ। রাষ্ট্রবোধ, সঙ্ঘ-বিচারধারাকে এখনকার মাটি থেকে চিরতরে মুছে দিতে বধ্যভূমি রচনার কাজ চলেছিল।**

গত মে মাসের গোড়ায় নির্বাচন পরবর্তী যে মহাতাণ্ডব সারা রাজ্য জুড়ে সর্বসমক্ষে 'নিঃশব্দে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কয়েক বছর ধরে সারা পশ্চিমবঙ্গে ইতিউতি উন্মত্ততার যে ভয়ংকর কদর্য-কর্মের রূপ তার পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছিল, তা মোটেই সাদামাটা এক রাজনৈতিক

আক্রান্ত পরিবারের ঘরবাড়ি ঘুরে দেখছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়।

সংঘাত ছিল না। এ দুই রাজনৈতিক দলের দক্ষতার লড়াই মনে করলে ভুল হবে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোড়কের মধ্যে এক আগ্রাসী সম্প্রদায়ের সংঘটিত হত্যালীলা, সাম্প্রদায়িক সরোষ। ফলপ্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গ আড়েবহরে এক সাম্প্রদায়িক কসাইখানায় পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্রবোধ, সঙ্ঘ-বিচারধারাকে এখনকার মাটি থেকে চিরতরে মুছে দিতে বধ্যভূমি রচনার কাজ চলেছিল। অত্যাচার, লাঞ্ছনা, জুলুম, জরিমানা, ধর্ষণ আর ধ্বংসের করুণ সে কাহিনি, যাকে ওদের ভাষায় বলা চলে 'খেলা'। ঘরভাঙার খেলা, বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার খেলা। যে ধরনের খেলা দেখে অভ্যস্ত বাঙ্গালি হিন্দু। নিজের প্রাণ আর ধর্ম বাঁচাতে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি হিন্দু সীমানা পেরিয়ে অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে ভারতবর্ষে শরণার্থী হয়েছে, অনেকটা সেই ধরনের খেলা, তবে অবশ্যই এটা একটা ট্রায়াল। দেখে নেওয়া বাঙ্গালি হিন্দু যদি এতেও চুপ থাকে, নেমে আসবে আরও গাঢ় সেই অন্ধকার। যা থেকে কোনো সনাতনীর রেহাই পাবার নয়।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাঙ্গলার মিডিয়ায় তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়া একেবারেই নিশ্চুপ। বুদ্ধিজীবীর মুখে ছিল কুলুপ। প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে ওঠার রাস্তা নেই। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে খানিক আভাস পাওয়া গিয়েছিল বটে, বাস্তব পরিস্থিতি ছিল তার চাইতেও ভয়ংকর।

ভোট তো সারা দেশেই হয়, রাজ্যে রাজ্যে হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো সহিংসতা কোথায় হতে দেখেছেন? আপনারা ২০১৮ সালের হত্যালীলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হতে দেখেছেন। কিন্তু রক্তে- শোকে-সন্তাপে তা তাকে বহুগুণ ছাপিয়ে গেছে। ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা জুড়ে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং রাষ্ট্রবাদী অরাজনৈতিক স্বয়ংসেবকদের উপর নেমে এলো ভয়ংকর আক্রমণ, কোনো সভ্য দেশে যা কল্পনা করা যায় না। আক্রমণের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রবাদী বাঙ্গালি হিন্দু। কোন্ বাড়ি ভাঙা হবে, কোন্ নারী ধর্ষিতা হবেন, ধর্ম দেখে দেখে চিনিয়ে দেবার কাজ করেছিল শাসক-দালাল প্রতিবেশী হিন্দু। বিধর্মী হার্মাদকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে ব্যাপক ব্যবহার এই প্রথম, যদিও তার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল বিগত এক দশক ধরে। এই যদি প্রবণতা হয়, আক্রমণকারী কারা তার পরিচয় নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গলার কোনো রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা-কর্মীই কিন্তু সুরক্ষিত থাকবেন না। এ এক আগুন নিয়ে খেলা হবে। রবীন্দ্রনাথের কথায়— 'আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে।'

আমরা সমাজের উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করি না। কিন্তু পরিসংখ্যান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, যারা নিধন হয়েছেন তারা প্রায় সবাই সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব, আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিইটর। তারা ব্রাত্যজন, তারা বনবাসী, তারা অন্তেবাসী প্রান্তবাসী। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় মানুষের উপরে টার্গেট করেছে এই হিংস্রতা। হিন্দু উচ্চ-নীচ কেউ বাদ পড়েনি। এর কি কোনো বিচারই হবে না? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? অন্য রাজ্যের মানুষ এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে চর্চা করছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বিচার চেয়েছেন। ভুক্তভোগী ছাড়া, রাজনৈতিক কর্মী সমর্থক ছাড়া বাঙ্গলার সাধারণ মানুষ তা জানতেই পারেননি। আমরা কেন প্রশ্ন করবো না শীতলকুচির ওই এসসি মিন্টু বর্মন, জগদ্দলের ওই এসসি শোভারানি মণ্ডল, বীনপুরের এসটি কিশোর মান্ডি, ডায়মন্ডহারবারের ওবিসি অরিন্দম মিদ্দে— আমার রক্ত, আমার ভাই! এটা রাজনৈতিক চাদরের আড়ালে এক পরিকল্পিত সম্প্রদায়িক জিঘাংসা। একদল হিংস্র মানুষকে দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনার খেলা। তা লঘু করে দেখলে চলবে না।

অনেকদিন ধরেই আমরা 'ল্যান্ড জেহাদ', 'লাভ জেহাদ' ইত্যাদি কথাগুলি শুনে আসছি। সীমান্তবর্তী গ্রামে ক্রমাগত অন্য ধর্মের মানুষের সংঘটিত জোরদারির মুখে শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের জমি বসতবাড়ি বিক্রি করতে একরকম বাধ্য হয়। অসতর্ক সেকুলার হিন্দু পরিবারের মেয়েটিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিবাহ করে তাকে ধর্মান্তরিত করা হয়, অনেকক্ষেত্রেই বিবাহ পরবর্তী জীবন সুখের হয় না। সম্প্রতি সেই সন্ত্রাসের একটি নয়া পদ্ধতি হলো হিন্দু কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া। বাম আমলে ভূমি সংস্কারের নামে অনেক কৃষক জমি চাষ করার সুযোগ লাভ করেছিল কয়েক দশক ধরে। কিন্তু তারা সকলে জমির পাট্টা পাননি। ফলে তাদের জমির সত্ত্ব তারা অফিসিয়ালি অধিকারভুক্ত হননি। এই অবস্থায় রাষ্ট্রবাদী শক্তির সঙ্গে থাকা কৃষকের জমি সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিচ্ছে। তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা দাবি করছে পুনরায় চাষের অনুমতি লাভের জন্য। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে জমিচষা সেই কৃষক তৃণমূলে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

এখন এই জোরজবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কি তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে, প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এরজন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। পেশীতে শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজন হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্টশক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে। আমরা চাই, একই বৃন্তে সত্যিকারের দুটি কুসুম ফুটে উঠুক। হিন্দু বলে নিজেরা গর্বিত হবার মধ্যে কোনো পাপ নেই। হিন্দু অস্মিতার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক থাকতে পারে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার নবজাগরণ হিন্দু নবজাগরণই ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রত্যেকেই হিন্দু অস্মিতার এক অনবদ্য মালা। মনীষী বিচিত্রায় ও ধারাবাহিকতায় ভেতর থেকে যথার্থ শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে তাই আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সবার আগে হিন্দুর প্রতি সংঘটিত জিঘাংসার দলিল পাতায় পাতায় লিখে যেতে হবে আমাদের। ▯

# ইসলামি জেহাদের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে

**বিজয় উৎসবের নামে সবুজ আবির মেখে তৃণমূল নেতা, কর্মী সমর্থক ও জেহাদিরা রাজ্য জুড়ে যে হিংসা ছড়িয়েছে ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, তা কি শুধুমাত্র রাজনীতির হিংসা? মোটেও নয়। রাজনীতির নামে এই হিংসা পুরোটাই পরিকল্পনা মাফিক।**

**কৌশিক দাস**

পশ্চিমবঙ্গে একুশের নির্বাচনে ভোট পরবর্তী যে হিংসাত্মক লড়াই শুরু হয়েছে তা পুরোটাই পূর্ব পরিকল্পিত, তা হলো হিন্দু নিধনের চক্রান্ত। যাকে কোরানের ভাষায় 'জেহাদ' নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

কী এই জেহাদ? ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য অমুসলমান কাফেরদের বিরুদ্ধে সব রকমভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করাই হলো জেহাদ। আরবি জেহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো, 'উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা'।

কাফের কারা? কাফের একটি আরবি শব্দ, যা আরবি কুফর ধাতু থেকে আগত। যার ব্যবহারিক অর্থ হলো অবাধ্যতা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় কাফের তারাই যারা ঈমানের বিপরীত। যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশ নবি অথবা ইসলামে রসুলের বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে, প্রত্যাখ্যান করে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি একজন কাফের। কাফের শব্দের আসন মানে হলো যে কোরান মানে না, অর্থাৎ সমস্ত অমুসলমান। সুতরাং হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি সবাই কাফের এবং মুসলমানের কাছে বধযোগ্য। কাফের আবার দু' রকম, খ্রিস্টান, ইহুদি প্রভৃতি যারা মূর্তি পূজা করে না তারা অপেক্ষাকৃত ভালো কাফের। এরা জিজিয়া কর দিয়ে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা যারা মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে তারা নিকৃষ্টতম, ইসলামের চোখে তাদের বাঁচাবার কোনো অধিকারই নেই।

জেহাদের একটাই উদ্দেশ্য, সারা পৃথিবীতে যেন-তেন-ভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বলতে শুধুমাত্র সশস্ত্র লড়াই বুঝায় না, ইসলামের পক্ষে অমুসলমান হিন্দু কাফেরদের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম কাজকেই বুঝায়। ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরি করা, প্রবন্ধ লিখে তথ্য বিকৃতি করে বা যে কোনো উপায়ে অমুসলমানদের বিভ্রান্ত করা, বোকা বানানো, প্রবঞ্চিত করা, ভুলিয়ে ধরে এনে হত্যা করা, ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু নারী অপহরণ বা ধর্ষণ করা, হিন্দুদের ভয় দেখানো, কিংবা তাদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করে হিন্দুদের দিয়েই হিন্দুদের জব্দ করা, দমন করা, লুণ্ঠন করা বা আর্থিক ক্ষতি ঘটানো এসবই জেহাদ।

*আদালতের নির্দেশে আক্রান্ত অঞ্চল ঘুরে দেখছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।*

প্রায় দেখা যায় মুসলমান যুবকরা হিন্দু মেয়েদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিয়ে করে বা বিয়ের আগেই শারীরিক সম্পর্ক করে বিয়েতে বাধ্য করে, এটাও এক ধরনের জেহাদ। একে লাভ জেহাদ বলা হয়।

এটি মূলত বিয়ের মাধ্যমে হিন্দু মেয়েকে ইসলামে ধর্মান্তরকরণের বন্ধে যে নতুন আইন পাশ হয়েছে তা 'লাভ জেহাদ' আইন নামে

পরিচিত। এতে যেমন একটি হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করা গেল আবার একটি হিন্দু পরিবারকেও কবজা করা গেল। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের হাত করে তাদের দিয়ে ক্রমাগত আর এক হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজকে কলুষিত ও হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলাও এক ধরনের জেহাদ। আবার হিন্দুদের চোখের সামনে গো হত্যা করে তাদের মনে কষ্ট দেওয়াটাও জেহাদের মধ্যেই পড়ে। আবার অনেক মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ও অভিনেতা আছেন, যারা সাহিত্যে চর্চা ও অভিনয় জগতের মাধ্যমে নিজেকে মহান উদার সেকুলার মুসলমান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা যদি একটু খোঁজ করি তাহলে দেখতে পাবো, এই সব মুসলমান কবি, সাহিত্যিক ও অভিনেতাদের স্ত্রী কিন্তু হিন্দু ধর্মেরই। অর্থাৎ এরা হিন্দু নারী বিয়ে করে কোরানে বর্ণিত জেহাদের একটি কর্মকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়ে সাকার করেছেন। আসলে এরা সবথেকে বড়ো জেহাদি। সেই জন্যই মুসলমানরা এদের কিছু বলে না। এরা যদি প্রকৃতই হিন্দু দরদি হতো, তাহলে তাদের জাতভাইরা তাদেরকেই আগে হত্যা করতো। কারণ ইসলামে 'মুশারিক' বলে একটা কথা আছে। এর অর্থ এই, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও জেহাদ করে না তাদের আল্লা কখনোই মাফ বা ক্ষমা করে না। এই মুশারিকদের জন্য কিন্তু কাফেরদের মতোই কঠিন শাস্তির বিধান আছে কোরানে।

ইসলামে 'মুর্তাদ' বলে একটি কথা আছে এর অর্থ ধর্মত্যাগী। কোনো মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে মুর্তাদ বলে এবং যে কোনো মুসলমানের অধিকার আছে সেই মুর্তাদকে হত্যা করার। মুশরিক ও মুর্তাদকে হত্যা করাটাও জেহাদের অঙ্গ। তাহলে দেখা যাচ্ছে জেহাদের অর্থ প্রবল আকারে অতি ব্যাপক। জেহাদের প্রকৃত অর্থ হিন্দুদের বুঝতে না দেওয়ার জন্য মুসলমান এবং তাদের অনুগত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। কারণ জেহাদের সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের ভবিষ্যৎ। আর জেহাদের প্রকৃত মানে সময় মতো বুঝতে না পারার উপর নির্ভর করছে হিন্দুদের অস্তিত্ব। আর সেকুলার হিন্দুরা এতটাই বোকা যে, এদের মহানতাই আকৃষ্ট হয়ে স্বধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে 'ধর্মের থেকে মনুষ্যত্ব বড়ো' এই ভেবে নিজেরই মারাত্মক সর্বনাশ ডেকে আনছি।

কোরানে ও হাদিসে জেহাদের মানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। কোনো মহানুভবতা, আধ্যাত্মিকতা এর মধ্যে নেই। ইসলামের স্বার্থে অমুসলমান হিন্দু কাফেরদের যে কোনো ভাবে হত্যা করা, আক্রমণ করা, লাঞ্ছিত করা, ভীত করা, লুণ্ঠন করা, ধর্ষণ করা, মন্দির বা দেব-দেবীদের মূর্তি ভাঙাও জেহাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আরেকটা কথা বুঝতে হবে— জেহাদই কিন্তু ইসলামের প্রথম এবং সর্বোচ্চ আবশ্যিক কর্তব্য। কোনো মুসলমান ব্যক্তিগত জীবনে যত মহান হলেও বা সৎ জীবন যাপন করলেও সে কিন্তু স্বর্গ বা জাহান্নামে যেতে পারবে না যদি না সে জেহাদে অংশগ্রহণ করে। তাই মুসলমানরা স্বর্গসুখ প্রাপ্তির জন্য জেহাদকেই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে।

১৯৪৭ সালে ভারতকে জেহাদের মাধ্যমে খণ্ডিত করে পাকিস্তান তৈরি করা হয়েছিল। পাকিস্তান হয়েছে ইসলামিক দেশ। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হতে পারতো। কারণ এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের তৎকালীন নেতারা একটি যুক্তি অবলম্বন করলো। তাদের মতে সব ধর্মই সমান। সব ধর্মই সত্য। সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে। সুতরাং সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার। যে যার মাশুল আজ ভারতের হিন্দুদের প্রাণের বিনিময়ে অত্যাচারিত হয়ে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ দিতে হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোট মিটে যাওয়ার পর বিজয় উৎসবের নামে সবুজ আবির মেখে তৃণমূল নেতা, কর্মী সমর্থক ও জেহাদিরা রাজ্য জুড়ে যে হিংসা ছড়িয়েছে ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, তা কি শুধুই মাত্র রাজনীতির হিংসা? মোটেও কিন্তু তা নয়। রাজনীতির নামে যে হিংসা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পুরোটাই কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক। যেখানে বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দু বিজেপি সমর্থকদের ঘর বাড়ি ভেঙে লুটপাট করে জ্বালিয়ে দিয়ে তাদেরকে জন্ম ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কিন্তু কোথাও কি আমরা এটা দেখেছি যে, মুসলমান বিজেপি সমর্থকরা তাদের অত্যাচারে আক্রান্ত হয়েছে? হয়নি! কারণ তারা বেছে বেছে হিন্দুদেরই মারছে। হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে কিংবা মুখে বিষ দেওয়ার মতন নির্মম পাশবিক অত্যাচারের নামে জেহাদ করা হচ্ছে। তাদের জেহাদকে সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন করার মূল কাণ্ডারি হচ্ছে অবোধ, স্বার্থলোভী হিন্দু ভাইয়েরাই। আজ ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনাকে নিন্দা জানিয়ে যেখানে বাংলাদেশ, কর্ণাটক, কেরল-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসী হিন্দু বাঙ্গালিরা প্রতিবাদের ঝড় তুলে সরব হয়েছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থলোভী হিন্দুরা তাদের লেলিয়ে দিচ্ছে আর একজন হিন্দু ভাইকে হত্যা করার জন্য। সেই সব সেকুলার হিন্দুদের জন্যই বার বার হিন্দুত্ব ঘোর সংকটের মুখে পড়েছে। ভারতের এই স্বার্থলোভী হিন্দুরা নিজের আখের গোছানোর তাগিদে কখন যে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। সেই সময় কিন্তু আর বেশি দূরে নয়। যখন পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করবে তারা।

কারণ তাদের এই জেহাদের অন্তরালে লুকিয়ে আছে সমগ্র ভারতকে হিন্দুশূন্য করে ইসলামিক রাজত্বে কায়েম করা। তাই সময় বলে দিচ্ছে, তাদের প্রতি উদার ও মহানুভবতা নয়, বরং স্বার্থ ত্যাগ করে ইসলামের জেহাদকে প্রতিরোধ করতে সমগ্র হিন্দু সমাজ সংগঠিত হয়ে এই লড়াইয়ে অংশীদার হতে হবে। কারণ দেশের ভবিষ্যৎ কখনো অহিংসভাবে রক্ষা করা যায় না? যদি করা যেত তাহলে কাশ্মীরে সেনা জওয়ান না পাঠিয়ে শান্তির সৈনিক পাঠানো হতো। তাই ইসলামিক জেহাদকে প্রতিরোধ করতে হলে নিরস্ত্র নয় বরং সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে। কারণ নিরস্ত্র হাতে অহিংসা ও শান্তির মাধ্যমে হয়তো কয়েকদিনের জন্য হিংসাত্মক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে, কিন্তু হিন্দুদের অস্তিত্বকে ইসলামিক জেহাদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। তাই আমাদের হিন্দু বাঙ্গালিদের রক্ষা করতে হলে সকলকে একত্রিত হয়ে ইসলামি জেহাদকে কড়া হাতে দমন করতে হবে। ▯

# বিজেপি ক্ষমতা দখল করতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হবার পথ প্রশস্ত হলো

**মোহিত রায়**

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। সব যুদ্ধে জয় হয় না, হারলে হার স্বীকার করে আত্মসমীক্ষণ করাটাই শ্রেয়। নির্বাচনের পূর্বে এক রাজ্য নেতা সংবাদপত্রে জানিয়েছিলেন যে আদর্শ ধুয়ে জল খেয়ে কোনো লাভ নেই, ক্ষমতা দখলই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁরা এখন দলের কর্মীদের বোঝাতে চাইছেন যে এই নির্বাচনে তারাই জিতেছেন কারণ ২০১৬-র বিধানসভায় ৩ জন বিধায়ক থেকে ২০২১-এ ৭৭ জন হয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ১২২টি বিধানসভায় এগিয়ে থেকেও ক্ষমতা দখল করতে না পারাকে যারা জয় বলে দেখাতে চাইছেন তাঁরা তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে চাইছেন। বিশেষত সেই সব নেতাদের যারা সামান্য অবস্থা থেকে এখন রাজকীয় জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন তাদের পক্ষে ব্যর্থতার দায়িত্ব নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে বলে দেওয়া হলো হরিপদ ভারতী, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর মতো নেতাদের কাছ থেকে দল কিছুই পায়নি। নির্বাচনের প্রার্থী চয়নের সময়ই এই বিষয়টি বাঙ্গলার মানুষ বুঝতে শুরু করে যে ক্ষমতার লোভে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অন্য দল থেকে প্রার্থী নেওয়া ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়, কিন্তু দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রতারকাদের প্রার্থী নির্বাচন করা শুধুই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না অর্থনৈতিক দুর্নীতি থেকে নারীসংক্রান্ত দুর্নীতি তাতে জড়িত, সে অভিযোগও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিতে হবে।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের হিসাব ধরলে ২০২১-এর বিজেপির ভোট কমেছে প্রায় ২ শতাংশ, কিন্তু ২০১৯ সালের এগিয়ে থাকা আসনের সঙ্গে তুলনা করলে ২০২১-এ প্রাপ্ত আসন কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূলের থেকে মাত্র ৩ শতাংশ ভোটে পিছিয়েছিল, ২০১৯-এর জয়যাত্রাকে এগিয়ে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তৃণমূলের থেকে মাত্র ৩ শতাংশ ভোটে পিছিয়েছিল, ২০১৯-এর জয়যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিজেপির প্রয়োজন ছিল একটি ভোট বিস্ফোরণ। তা হয়নি। বিজেপিকে কারা ভোট দেয়? হিন্দুরা। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট ছিল ১০ শতাংশ, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তা হয়ে যায় ৪০ শষতাংশে। এই ভোট এসেছিল কংগ্রেস সিপিএমের হিন্দুদের ভোট। এবার সেই ভোট কিছু কমেছে আর বাম কংগ্রেসের সব মুসলমান ভোট ও অবশিষ্ট হিন্দু ভোট গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘরে। রাজ্যের মুসলমান জনসাধারণ মনে করেছেন বিজেপি তাঁদের মূল শত্রু। বিজেপির পাওয়া সব ভোট যদিও হিন্দুদেরই কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। গোদা হিসেবে তা মোট হিন্দু ভোটের ৫০ শতাংশেরও কিছু বেশি। সুতরাং এটা বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মনে করেননি তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিজেপির কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিজেপি কী মনে করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কোনো সমস্যায় আছে? আমরা অনেকেই দীর্ঘদিন বলে এসেছি যে এই নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব মানে ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, নাগরিকত্ব আইনের লড়াই, এনআরসি'র লড়াই, ধর্মীয় জনসংখ্যার ভারসাম্যের লড়াই। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের একটাই পরিণতি পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হওয়া। কিন্তু এই নির্বাচনী যুদ্ধে বিজেপি কী কখনো বলেছিল যে বিজেপি ক্ষমতায় না এলে হিন্দুদের বিপর্যয় ঘটবে? বিজেপি না জিতলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে? না, বিজেপি নেতৃত্ব এসব ভাবাদর্শের কথায় মাথা ঘামায়নি। বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্র বা ম্যানিফেস্টোতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে বিভিন্ন কিছু পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, প্রতিযোগিতা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাইয়ে দেওয়ার সঙ্গে। ১৩ দফা এই প্রতিশ্রুতি তালিকার শিরোনাম ছিল মহিলা, যুব, কৃষক, সুশাসন, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকাঠামো, পর্যটন, সংস্কৃতি, সবার বিকাশ, নতুন কলকাতা, আঞ্চলিক উন্নয়ন ও পরিবেশ। সবার জন্যই কিছু প্রাপ্তিযোগ আর সুশাসনের কিছু প্রতিশ্রুতি। হিন্দু ভোটের জন্য কিছু চালকলা নৈবেদ্য পুরোহিতগোষ্ঠীকে। কিন্তু বিজেপির এই সংকল্পপত্র পড়ে কেউ

**তৃণমূলের এই জয়ের পর মৌলবাদীরা আরও আক্রমণাত্মক ও শক্তিশালী হবে, মাদ্রাসা শিক্ষা আরও বিস্তৃত হবে। একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী আক্রমণ চালালে আগের মতনই পুলিশ কিছুই করবে না। পশ্চিমবঙ্গ দিনে দিনে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিবর্তিত হবে।**

ফঃ ২

ন্যূনতম বুঝতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের কোনো সমস্যা আছে। তিনদিন ধরে এখানে ইসলামি মৌলবাদীরা সারা রাজ্য জুড়ে ট্রেন বাস স্টেশন বাড়িঘর বিনা বাধায় আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারে, এখানে কালিয়াচক, খাগড়াগড়, ধুলাগড়, বসিরহাট, চন্দননগরের মতো ধর্মীয় সন্ত্রাস হয়, ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে সৃষ্ট এই রাজ্যে পরিবর্তিত ধর্মীয় জনসংখ্যা কি বিপদ তৈরি করেছে, অনুপ্রবেশ সমস্যা ইত্যাদি। এসব নিয়ে বিজেপির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতারা চুপ, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কেন ভাবতে যাবে তাঁদের ধর্মীয় অস্তিত্বের কোনো সমস্যা আদৌ আছে এবং তার সমাধানে বিজেপিকেই ভোট দিতে হবে।

আসলে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা ও চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন লোকেদের রাজ্য বিজেপিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে কেন্দ্র থেকে পাঠানো পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রতিনিধিরা সেভাবেই রাজ্যকে পরিচালনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের নেতারা স্রেফ দিল্লি অফিসের কলকাতা শাখার করণিক হয়েই খুশি থেকেছেন। চিন্তার দৈন্য এতটাই প্রকট যে বিজেপি একটি আকর্ষণীয় নির্বাচনী স্লোগান পর্যন্ত তৈরি করতে পারেনি। বস্তাপচা 'সোনার বাঙ্গলা' স্লোগান কেউ পাত্তাও দেয়নি। বিজেপিকে ঘুরতে হয়েছে তৃণমূলের নতুন স্লোগান 'বাঙ্গলা নিজের মেয়েকে চায়' বা 'খেলা হবে'র পিছনে। গত পাঁচ বছরে রাজ্য বিজেপি একটিও আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি। সব একদিনের কয়েক ঘণ্টার হইচই এবং ফটো সেশন। এমনকী নির্বাচনের কিছুদিন আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের দলের বুদ্ধিজীবীদের উপর বিশ্বাস না রেখে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কহীন দিল্লির নেতাদের ঘনিষ্ঠ বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য দেওয়া হলো। ফলে ২০০ আসন পেয়ে কে কোন মন্ত্রী হবে তার আলোচনাই একেবারে মণ্ডল স্তরে ছড়িয়ে পড়লো।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য অসমেও একই সঙ্গে নির্বাচন হলো। জম্মু কাশ্মীরের পরে ভারতে দ্বিতীয় মুসলমানপ্রধান রাজ্য অসম, মুসলমান জনসংখ্যা ৩৪ শতাংশ (২০১১), পশ্চিমবঙ্গে ২৭ শতাংশ (২০১১)। অসমের বিজেপি কী করলো? এহেন রাজ্যে শাসক দল বিজেপি নির্বাচনের কয়েক মাস আগেই অসম রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা অবলুপ্ত করল। অসম বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্র বা ম্যানিফেস্টোতে ১০টি উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু এছাড়াও সেই সংকল্পপত্রে ছিল একটি আলাদা অংশ যার শিরোনাম— অসমের সভ্যতাকে শক্তিশালী করা। পরিষ্কার ভাবে তাতে বলা হয়েছে এই নির্বাচনের সংকল্প অভারতীয় সংস্কৃতির হাত থেকে অসমকে বাঁচানো, লাভ জিহাদ বন্ধ করা, মৌলবাদকে প্রতিহত করা। অসমের নির্বাচনে বিজেপির প্রচারের প্রধান বিষয় ছিল— এটা সভ্যতা-সংস্কৃতির লড়াই। যাকে আরও পরিষ্কার ভাবে প্রচারের সময় বলা হয়েছে এটা সরাইঘাটের লড়াই যেখানে অসম বীর লাচিৎ বরফুকন মোগল আক্রমণকে রুখে দেন। অসমের বিজেপি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আদর্শের লড়াইও চালিয়েছে, অসমের অসমীয়া বাঙ্গালি হিন্দুরা বিজেপিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে।

প্রায় পাঁচ দশকের বিস্মৃতির পর হিন্দুত্ববাদী চিন্তকদের নিরলস প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ আবার আলোচিত হচ্ছিলেন, বাঙ্গালি হিন্দু ফিরে ভাবছিল দুর্গাপূজার সঙ্গে শ্রীরামের অবিচ্ছেদ্য যোগ, শিক্ষা জগৎ থেকে সংবাদমাধ্যম— সব জায়গাতেই হিন্দুত্ববাদী চিন্তা জায়গা করে নিচ্ছিল। কিন্তু কিছু অযোগ্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতার লোভের জন্য গত দু' দশক ধরে গড়ে ওঠা নির্মাণ অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেল, আবার জমি ফিরে পাওয়া কষ্টকর। এই বিজয়ের পর আগামী পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের ধর্মীয় অনুপাত আরও অনেকটাই পালটে যাবে, জয় বাঙ্গলা স্লোগানের সঙ্গে ইসলামি বাংলাদেশ আমাদের ভাষায় ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করবে। বামেরা চূড়ান্ত হারলেও শিক্ষা জগতে তাদের ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী চিন্তাই শাসন করবে, মৌলবাদীরা আরও আক্রমণাত্মক ও শক্তিশালী হবে, মাদ্রাসা শিক্ষা আরও বিস্তৃত হবে। একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী আক্রমণ চালালে আগের মতনই পুলিশ কিছুই করবে না। পশ্চিমবঙ্গ দিনে দিনে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিবর্তিত হবে। নতুন বাঙ্গালি নেতৃত্ব উঠে না এলে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতো নেতা তৈরি না হলে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিম বাংলাদেশ হতে আর বিশেষ দেরি নেই। ■

### ভ্রম সংশোধন

২১ জুন, ২০২১ তারিখের স্বস্তিকায় 'ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা হৃদয়ঙ্গম করেই হিন্দু সমাজকে উঠে দাঁড়াতে হবে' প্রবন্ধে ভুলবশত লেখকের নাম 'ধর্মপুত্র' হয়েছে। হবে 'গঙ্গাপুত্র'। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—স্বঃ সঃ


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

# ‘দিশি’ পত্রিকায় মোদীবধ মুখ ঢাকো লজ্জায়

**মোদীকে দানব বানানোর জন্য অতি সক্রিয় দেশি বিদেশি ক্ষেত্রে জোর রাজনৈতিক খেলা চলছে আর তাদের লেজুড়বৃত্তি করছে কিছু ক্রয়যোগ্য বেতনভুক সংবাদমাধ্যম। ‘নয়া’ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে উপনিবেশ বানাতে চাইছে। আপাতত ব্যর্থ হলেও তারা ভবিষ্যতে আরও চেষ্টা চালাবে।**

**সুদীপ নারায়ণ ঘোষ**

ভারত তথা হিন্দু সভ্যতা আজ গভীর সংকটে। দেশ যাঁকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হাল ধরতে দিয়েছে তিনি এযাবৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন, আর সেখানেই সমস্যা। কাদের সমস্যা? —যারা হিন্দু সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদগ্রীব। কেন বা কারা কীভাবে এই কাজ করছে তা বলার আগে আমরা বুঝে নেব কয়েকটা বিশেষ লক্ষণ।

এক বাজারি পত্রিকাগোষ্ঠীর তথাকথিত সাংস্কৃতিক শাখা নিরলসভাবে হিন্দু-ভারতীয় সভ্যতা বিলুপ্ত করার পবিত্র কর্তব্যে ধারাবাহিক প্রয়াস চালাচ্ছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এরাই বাঙ্গলার সংস্কৃতি জগতের ধ্বজাধারীর দাবিদার। তাদের সাম্প্রতিকতম সংখ্যায় (২ জুন, ২০২১) মোদীকে উৎখাত করার ঘৃণ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ‘আমি আমার চেয়ে বড়ো’ এই প্রচ্ছদ শিরোনামে। কি না বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তাঁকে— মেগালোম্যানিয়াক, অপ্রকৃতিস্থ, অন্ধ, আত্মভজনাকারী, অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত, দাম্ভিক, চিন্তাশক্তিহীন, রাজনৈতিক অহমিকাপূর্ণ, মূর্খ, নির্বোধ, অবিবেচক, ধুমধাড়াক্কা পদক্ষেপগ্রহণকারী, আত্মপ্রচারক, নাসিসিস্ট...!!! ব্যঙ্গার্থে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান মহানায়ক, মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়, মূর্তিমান বিশল্যকরণী প্রভৃতি। তাঁকে সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছে ধামাধারী দু’পয়সার সাংবাদিককুল। (এই নিবন্ধের আদৌ কোনো প্রয়োজন হতো না যদি না বাঙ্গলার পড়াশোনা করা মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই পত্রিকা পড়তেন, নিজেরা প্রভাবিত হতেন ও অন্য সরলমতি নাগরিকের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতেন এবং এর আগাগোড়া উদ্দেশ্যপূর্ণ মিথ্যায় পূর্ণ হতো।)

তাদের অভিযোগ : দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালের বেড সংখ্যা, অক্সিজেন, ভ্যাকসিন বাড়ানো উচিত ছিল। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগর, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে ঘনঘন প্রধানমন্ত্রী-সহ বিজেপির সব বড়ো বড়ো নেতাদের র‍্যালি এসব দায়ী।

জবাব : ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে তিনটে তালিকা আছে : কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যৌথ তালিকা। জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি ও স্যানিটেশন রাজ্যের তালিকায় পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা পরামর্শদানকারীর, তবে জরুরি ক্ষেত্রে শুধু নির্দেশ জারি করতে পারে। সরকারি হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরাও প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনবে না। তারা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে। যেমন আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের দায়িত্ব, কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি অবস্থা ছাড়া নির্বাচন-পরবর্তী হিন্দুবিরোধী তৃণমূলী সন্ত্রাসদমন বা অন্য কিছুই করতে পারে না। কোভিড মহামারীর শুরুতে প্রধানমন্ত্রী সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্স করতে চাইলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেননি। বলেন সিএএ থেকে মুখ ঘোরাতে কেন্দ্র সরকার হুমকি দিয়েছে। তিনি এখনও পর্যন্ত কোনও সভায় অংশ নেন না।

২০২০ সালে অতিমারি কমলে রাজ্য সরকারগুলোর দরকার ছিল স্বাস্থ্য

অবকাঠামো উন্নত করা। প্রধানমন্ত্রীকে কলঙ্কিত করার জন্য সংবাদমাধ্যম প্রচার চালাচ্ছে যে তিনি পুরোপুরি প্রতিটা কোভিড রোগীর জন্য নিজে কাঁধে করে অক্সিজেন সিলিন্ডার পৌঁছে দেবার জন্য দায়বদ্ধ। প্রথম ঢেউয়ের সময়েও প্রায় সমস্ত রাজ্যেই কোভিডের মতো অতিমারি মোকাবিলার জরুরি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব ছিল। একজনও জিজ্ঞাসা করছে না যে প্রথম তরঙ্গের পরে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকরা কী করছিলেন? যখন কিছু রাজ্য দ্বিতীয় তরঙ্গকে তুলনামূলকভাবে ভালো সামলাচ্ছে তখন অন্য রাজ্যগুলো কেন পারছে না? প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলেও তা কার্যকরী করার দায়িত্ব রাজ্যের। যেমন দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য যথাক্রমে ৮টা ও ৫টা অক্সিজেন সিলিন্ডার প্ল্যান্ট তৈরির অর্থ কেন্দ্র সরকার দিয়েছিল। দিল্লি ১টা করেছিল, পশ্চিমবঙ্গ ১টাও করতে পারেনি। বাকি টাকা কোথায় গেল?

নির্বাচন ও কুম্ভসেনার জন্য কোভিড ছড়িয়েছে— মহারাষ্ট্রে নির্বাচন বা কুম্ভ মেলা হয়নি, তাহলে সেখানে কেন সর্বোচ্চ মৃত্যুর হার, ইউপির চেয়েও বেশি? কৃষক আন্দোলন, কেরল, তামিলনাড়ু এসব থেকে কোভিড দ্বিতীয় ঢেউ ছড়িয়েছে। প্রচারণাকে গসপেল (এমন একটা আজগুবি দাবি যা নিয়ে কোনো যুক্তিতর্ক খাটবে না) হিসাবে চালানো হচ্ছে। মোদীকে দানব বানানোর জন্য অতি সক্রিয় দেশি বিদেশি ক্ষেত্রে জোর রাজনৈতিক খেলা চলছে আর তাদের লেজুড়বৃত্তি করছে কিছু ক্রয়যোগ্য বেতনভুক সংবাদমাধ্যম। 'নয়া' সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে উপনিবেশ বানাতে চাইছে। আপাতত ব্যর্থ হলেও তারা ভবিষ্যতে আরও চেষ্টা চালাবে।

কীভাবে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়ে খেলা হলো দেখুন। ২০২১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল। সারা পৃথিবীতে ভারতীয় ভ্যাকসিন ৮৭টি দেশে রপ্তানি হয়েছিল। কৃষক আন্দোলন একেবারে ঝিমিয়ে গিয়েছিল। এবার ভোটের মাস এপ্রিল, ৭ তারিখ বড়োসড়ো মাওবাদী আক্রমণ হলো। ১০-১৫ এপ্রিল কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ সুনামির মতো আছড়ে পড়ল ভারতে। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে এরকম হলো না। ২০ এপ্রিল পুরো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের অপ্রতুলতা নিয়ে শোরগোল তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৩-৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মার্কিন ভ্যাকসিন ভারতে চালাতে হবে তো। চীন ও তাদের বেতনভুক ভারতীয় চরেরা বারণ করল ভ্যাকসিন নিতে। বিজেপি বা মোদীর তৈরি ভ্যাকসিন নিলে ক্ষতি হবে। অনেক মানুষ ভয়ে নিল না। প্রচুর ভ্যাকসিন নষ্ট হলো। পরে তারাই চীৎকার জুড়ল কেন ভ্যাকসিন নেই। অবার তারাই দাবি করতে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে ভ্যাকসিন জোগাড় করো। পরে বলল দামের কেন তফাত হবে। বলল আমরা রাজ্যের দাম বহন করব। পরে বলল কেন্দ্রীয় সরকারকে সব দাম চোকাতে হবে। তারা আরও বলল বেসরকারি উৎপাদনকারীদের ভ্যাকসিনে অনুমোদন দিতে হবে। এখন বলছে কেন্দ্রকে সেই সব দাম মেটাতে হবে। এইভাবে এমন এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করল আত্মসুখী হিন্দু ভোটাররা ভয়ে ভোট দিতে বেরল না। মুসলমানরা কিন্তু দলে দলে বেরোল। তাদের মধ্যে অনেক ভুয়ো। বিজেপি হেরে গেল, সেটাই লক্ষ্য। এখন তারা তৃতীয় ঢেউয়ের ছড়িয়ে পড়াকে মদত দিচ্ছে। এবং সেটা শুরু হবে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে।

মোদী দ্বিতীয় ঢেউ বুঝতে পারেননি বলে শোরগোল তুলছে কিন্তু ১৭ মার্চ যখন ভারতে গড় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০০০-এর নীচে তখন প্রধানমন্ত্রী সিএমদের সঙ্গে মিটিং-এ সতর্ক করে দিয়েছিলেন। প্রচুর নির্দেশিকা ও যোগাযোগ করা হয়েছিল। মমতা যোগ দেননি। ভারত জিএভিআই-র উদ্যোগে ও চুক্তি অনুসারে গরিব দেশগুলোকে মাত্র ১/৩ ভাগ ভ্যাকসিন পাঠিয়েছিল। কেন্দ্র রাজ্যগুলোকে বিনা মূল্যে ভ্যাকসিন দেয়।

ভারতে কোভিড কেস সর্বাধিক! —মিথ্যা। পশ্চিমি মিডিয়াগুলো ভারত সরকারকে সাংঘাতিক ভাবে আক্রমণ করেছে— নিউইয়র্ক টাইমস, দ্যা গার্জিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান টাইমস, বিবিসি, সিএনএন এরা শুধুমাত্র ভারতের সরকারকে নয়, সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকেই এর জন্য দায়ী করছিল। ভারতকে তখন ওরা 'ভাইরাল অ্যাপোক্যালিপ্স' বলছিল। ভারতে নাকি দিনে এক লক্ষ থেকে চার লক্ষ পর্যন্ত মানুষ পজিটিভ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যায় মানুষ মারা যাচ্ছে, অক্সিজেনের অভাবনীয় ঘাটতি, হাসপাতাল ও বেডের মর্মান্তিক ক্রাইসিস ইত্যাদি। তারা বলছিল যে ভারতের স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক পরিষেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাজার হাজার মাস্কবিহীন মানুষের উপস্থিতিতে, ডিস্ট্যান্সিং না মেনে, পশ্চিমবঙ্গে র‍্যালি করতে যাচ্ছেন। আবার প্রধানমন্ত্রী কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্নান করতে দিচ্ছেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে, তারা রোগ নিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরছে, ফলে সংক্রমণ আরও বেড়ে যাচ্ছে --- এভাবে পরিস্থিতি ক্রমাগত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

এইভাবেই কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরিয়ে জো বাইডেনকে নিয়ে আসা হয়েছিল কোভিড আসার আগে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের জেতা নিয়ে প্রায় কোনো সংশয়ই ছিল না। আমেরিকার অর্থনীতি, সামাজিক সুরক্ষা ও সম্মানকে তিনি এতটাই ঊর্ধ্বগামী করেছিলেন যে, তাঁর কথাবার্তা যতই পাগলাটে মনে হোক না কেন আমেরিকার মানুষ দলে দলে তাঁকেই ভোট দিত। সেই সময়েই কোভিড এল আর আমেরিকার মিডিয়া দিনের পর দিন পরিসংখ্যানের বিধ্বংসী রূপ দেখাতে লাগল। বলতে লাগল যে প্রতিটি আমেরিকান শহর অচল হয়ে যাচ্ছে, দলে দলে লোক মারা যাচ্ছে, সংক্রমণ বাড়ছে, ওষুধ নেই, ভেন্টিলেটার নেই, অক্সিজেনের অভাব, হাসপাতালের আভাব, পরিষেবা খারাপ, অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাপারটাকে একদমই পাত্তা দিচ্ছেন না, কারণ তিনি চাইছেন যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মারা যাক, কৃষ্ণাঙ্গরা মারা যাক, বাইরের দেশ থেকে আসা মানুষ মারা যাক, গরিব মানুষেরা শেষ হয়ে যাক।

এভাবে এমন প্রচারের জোয়ার উঠেছিল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হেরে গেলেন। যদিও তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে প্রচুর ভোট পেলেন, আগেরবারের থেকেও তিনি বেশি ভোট পেলেন। অন্যদিকে তাঁর চেয়েও বেশি ভোট পেয়ে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হলেন। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই কিন্তু আমেরিকার মিডিয়া ভাইরাসের ভয়াবহতা নিয়ে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিল, যেন তার পরদিন থেকেই পুরো আমেরিকা সুস্থ হয়ে উঠল, চিকিৎসা পরিষেবা ঠিক হয়ে গেল।

ট্রাম্প হু-কে আমেরিকার অর্থপ্রদান বন্ধ করেছিলেন আর বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর প্রথমেই তাকে পুনরায় অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আমেরিকার মিডিয়া চুপ করে গেল। অথচ মে মাসের গোড়ায় আমেরিকাতে প্রত্যেকদিন ষাট হাজার জনের পজেটিভ হওয়ার রিপোর্ট জমা পড়ছে। অবস্থাটা আগের থেকে একেবারেই ভালো নয়, অথচ ওরা রিপোর্টিং করা বন্ধ করে দিয়েছে, মিডিয়া আমেরিকার প্রশাসন বা প্রেসিডেন্টকে দায়ী করা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আর বলা হচ্ছে না যে আমেরিকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে।

বিদেশি মিডিয়াগুলো সারাক্ষণ বলছে যে ভারতবর্ষে নাকি সংক্রমণের বিস্ফোরণ হচ্ছে অথচ বাংলাদেশে তো কিছু হচ্ছে না! তার মানে বাংলাদেশে সবাই মাস্ক পরছে, সোশ্যাল ডিসটেন্স মানছে, কোনো জমায়েত করছে না, সবাই সারাক্ষণ স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করছে। পাকিস্তানেও কিছু হচ্ছে না! যে পাকিস্তান কোনো টেস্টিংই করে না তারা ভারতবর্ষকে সাহায্য করবে বলছে! শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মায়ানমার বা আফগানিস্তানের কোথাও কিছু হচ্ছে না অথচ ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এরা তো ভারতের পাশাপাশিই আছে। তাহলে ভারতবর্ষে এত ভয়াবহ সংক্রমণ হচ্ছে বলে আমরা খবর পাচ্ছি কেন?

আজকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ভারতকে নিয়ে ওই চড়া সুরটা একটু কমিয়েছে, কারণ এখন আসল কাজটা হয়ে গেছে, এবার ভারতকে ভাঙার শক্তিগুলো সক্রিয় হতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গ সবথেকে বিপদগামী দুর্বল যেখান থেকে ভারতভাঙার শুরু হয়ে যেতে পারে। স্লিপার সেলগুলো এবার জাগ্রত হতে আরম্ভ করবে। তাই ভারতকে নিয়ে তীব্রভাবে সমালোচনা করার আর অতটা প্রয়োজন নেই এখন। আশঙ্কা আট মাস পরে যখন উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন শুরু হবে তখন আবার এরকম নেতিবাচক প্রচার প্রয়োজন হবে। যে বা যাঁরা এই ধরনের রিপোর্টগুলো লিখছেন, যেমন নিউইয়র্ক টাইমসে যাঁরা এধরনের রিপোর্টিং করছেন তাঁরা কিন্তু কোনো ইউরোপীয় বা আমেরিকান নন, তাঁরা ভারতীয়, হয় তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের ইন্ডিয়া করেসপন্ডেন্ট অথবা তিনি হয়তো গেস্ট কলামলেখক, সেটা অরুন্ধতী রায়ের মতো নামকরা লেখক হতে পারেন, যিনি বুকার প্রাইজ বা অন্যান্য খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক লেখক হিসেবে তাঁর যেহেতু খ্যাতি আছে তাই গার্জিয়ানের মতো কোনো নিউজপেপার হয়তো অতিথি লেখক হিসেবে তাঁর লেখা ছাপাচ্ছে। সেখানে এনার প্রত্যেক শব্দের জন্য দু' ডলার করে পাচ্ছেন। সুতরাং লেখার মধ্যে যত শব্দ বাড়ানো যাবে তত ডলারের পরিমাণ বাড়বে। নরেন্দ্র মোদিকে শুধু ফ্যাসিস্ট বললে মাত্র দু' ডলার পাওয়া যাবে। তাঁকে রাইট-উইং-ফান্ডামেন্টালিস্ট ফ্যাসিস্ট বললে তার জন্য ৪×২=৮ ডলার পাবে। অতএব যত সমালোচনা করবে বা তীব্র প্রতিক্রিয়ামূলক শব্দ প্রয়োগ করবে তত উপার্জন বেশি হবে। খেলার মধ্যে কিন্তু আরও অন্য খেলা চলছে। এই নির্বাচনটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্রেকিং ইন্ডিয়া ফোর্সগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝতে হবে।

**ভারতের সভ্যতা হাজার হাজার বছরের পুরনো। সে যদি তার নিজস্ব মহিমায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তাহলে পুরো পৃথিবীতে এতদিন ধরে যারা আগ্রাসন করেছে তাদের নগ্ন মিথ্যাগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে। জানা যাবে, খ্রিস্টান যুগের আগে পৃথিবীব্যাপী যে সভ্যতা ছিল, ভালো মন্দ যাই হোক সেটা ভারতের সভ্যতারই প্রসারিত রূপ।**

মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার খবর, প্রতি দশ লক্ষ সংক্রমিত মানুষের মধ্যে হাঙ্গেরিতে এক সময় মারা যাচ্ছিল ২৭১৯ জন, ইটালিতে ১৯৬০ জন, ইংল্যান্ডে ১৮৬৮ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫৭ জন। আরও অনেক দেশ আছে, এই সকল দেশে প্রতি দশ লক্ষ সংক্রমিত মানুষের মধ্যে গড়ে পনেরোশোর উপরে মানুষ মারা যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। সেখানে ভারতের মৃত্যুর সংখ্যাটা ১৩৪ জন। এপ্রিল মাসের রিপোর্ট ছিল। ভারতের নীচে আর একটাই বড়ো দেশ আছে, সেটা চীন, যেখানে প্রতি দশ লক্ষ সংক্রমিতদের মধ্যে মাত্র তিনজন মারা যাওয়ার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে (এর রহস্য অন্যত্র)। এবারে ইতালিতে যখন ১৯৬০ জন করে মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল তখন কি ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে সারা বিশ্ববাসী সমালোচনা করে তুলোধোনা করেছে? হাঙ্গেরিতে যখন ২৭১৯ জন, ইংলন্ডে ১৮৬৮ জন মারা যাচ্ছিল তখন সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কি কেউ দোষারোপ করছিল? সেখানকার স্বাস্থ্যপরিষেবা নিয়ে কি কেউ প্রশ্ন তুলছিল? ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাঙ্ঘাতিক ফিগার দেখাচ্ছিল, কিন্তু এখন ওখানে কী হচ্ছে সেটা কেউ জানতে পারছে না কেন?

মিডিয়া এখন আর ওদিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, কারণ এখন ওদের প্রিয় বন্ধু বাইডেন

ক্ষমতায় চলে এসেছে। আর বাইডেনের চেয়ারটা পুরোপুরি চীনের কেনা। তাই হু'র পুরোপুরি পাশে রয়েছে বাইডেন। যারা আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে এই রিপোর্টিংগুলো করছে, এরাই কৃষক আন্দোলনকারীদের হয়ে সোচ্চার হয়েছিল— হে বিশ্ববাসী দেখতে এসো, এটাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলন। যেন এটা তীর্থস্থান। এরাই এখন কৃষকদের ভুলে সংক্রমণের সংখ্যা নিয়ে পড়ে আছে। এরাই এক সময় হাথরাস কাণ্ড নিয়ে লিখছিল, এরাই দিল্লি দাঙ্গা নিয়ে লিখছিল, এদের কাছেই পশ্চিমবঙ্গ খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই ভোটের শেষ চার দফার ঠিক আগে ভারতকে নিয়ে সাংঘাতিক খবর ছড়িয়ে এমন একটা ছবি তৈরি করেছিল যেন ভারতের ঘরে ঘরে লোক মারা যাচ্ছে। এভাবে প্রচার করে ওরা পশ্চিমবঙ্গে মোদীজীর হার সুনিশ্চিত করতে চাইছিল। এখন সেটা সুনিশ্চিত হয়েছে, এবার ভারতে বিভাজন তৈরি করে ভাঙার ওদের অনেক দিনকার যে প্রস্তুতি, সেটার দিকেই এগিয়ে চলেছে। ভিতরের সেলগুলো জেগে উঠছে, বাইরে থেকে ভায়োলেন্সের মোটিভগুলোকে সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে এবং তার ফালফল আমরা দেখতে শুরু করেছি। এই দিকটাকে একটু বোঝার প্রয়োজন আছে। কারণ সামনে যে খেলা চলছে তার পেছনে আরও বড়ো খেলা রয়েছে।

মোদীর অতি জাতীয়তাবাদ, মোদীর ঔদ্ধত্য, মোদীকে সমস্ত রাজ্যে জেতার উন্মাসিকতা এবং এটার জন্যই উনি হিন্দু উৎসব আটকাবেন না, তার জন্যই এই ভাইরাস পৃথিবীজুড়ে বিভীষিকা তৈরি করছে— এভাবে এমন এক আবহ তৈরি করা হলো যে অনেকেই ঘাবড়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের আত্মসুখী কিছু হিন্দুকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তাদের মোদীবিমুখ করা হলো, বিজেপি ক্ষমতা থেকে দূরে থেকে গেল; যতই অযোগ্য হোক, এই হলো তুরুপের তাস, ভারত ভাঙার কাজ এই করতে পারবে, অতএব তাকেই আরও মজবুতভাবে পুনরায় বসানো হলো। যেখানে ভারতে এখনো পর্যন্ত প্রতি দশ লক্ষতে মৃত্যুর হার ১৩৪ জন, যে কোনো উন্নত দেশের তুলনায়, যে সকল দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই ভালো তাদের থেকে অনেক ভালো জায়গাতে আছে ভারত। অতএব এর পেছনে একটা ভারত ভাঙার শক্তি কাজ করছে।

কী ভাঙবে? কেন? কীসের ভয়? ভারতীয় সভ্যতাকে ভয়। এটা সভ্যতাসমূহের সংঘর্ষ। ভারতের সভ্যতা হাজার হাজার বছরের পুরনো। সে যদি তার নিজস্ব মহিমায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তাহলে পুরো পৃথিবীতে এতদিন ধরে যারা আগ্রাসন করেছে তাদের নগ্ন মিথ্যাগুলো প্রকাশিত হয়ে যাবে। জানা যাবে, খ্রিস্টান যুগের আগে পৃথিবীব্যাপী যে সভ্যতা ছিল, ভালো মন্দ যাই হোক সেটা ভারতের সভ্যতারই প্রসারিত রূপ ছিল। এখন শুধুমাত্র ভারতে সেই সভ্যতা টিকে আছে তাকে ধ্বংস না করতে পারলে আব্রাহামিক ধর্মগুলোর মিথ্যা গল্পটার সৌধ ভেঙে পড়বে। গল্পটা এই যে খ্রিস্টান ও মহম্মদী রিলিজিয়নের আগে পৃথিবী অসভ্য ছিল। এটাকে আটকানোর জন্যই শেষ মরিয়া প্রয়াস চলছে। ◻


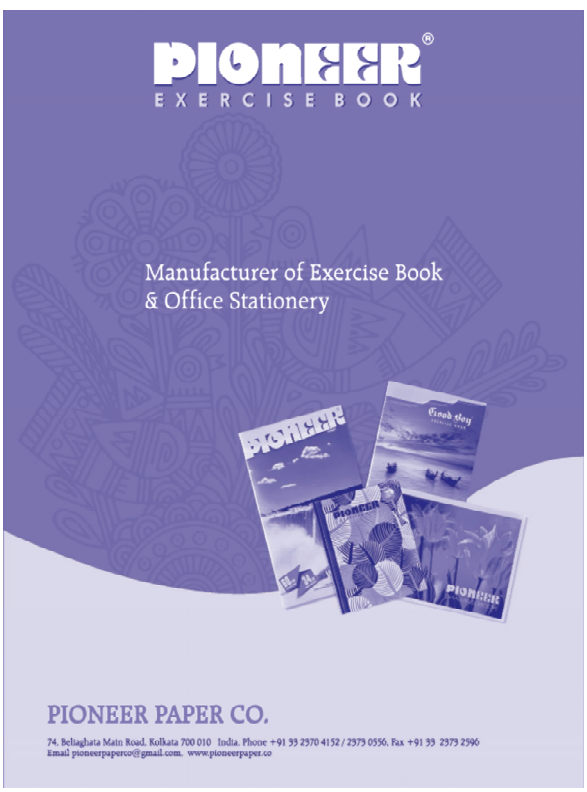

# অত্যাচার করে স্বয়ংসেবকদের দমিয়ে রাখা যায় না

## সঙ্ঘ তো নির্বাচনে দাঁড়ায়নি। মিছিল মিটিং করেনি। সঙ্ঘের ব্যানারে বিজেপির সমর্থনে কোনো পথসভা হয়নি। তাহলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর কেন এই অত্যাচার?

**জয়ন্ত পাল**

২০২১-এর সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভাবে জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করেছে। ২৯২টি আসনের মধ্যে তারা ২১৩টি আসনে জয়লাভ করেছে। এই বিপুল জয়ের পরেও তারা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ২ মে থেকে এখন পর্যন্ত ৪০ জন পার্টির সমর্থক কর্মীকে খুন করা হয়েছে। হাজার কর্মীকে গৃহছাড়া, গ্রামছাড়া করা হয়েছে। শুধু বিজেপি নয়, সঙ্ঘ ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের এবং তাদের পরিবারের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে বিজেপির সমর্থকদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া এবং মা-বোনেদের ধর্ষণ করা হয়েছে। বহু স্বয়ংসেবকের রুটি রুজি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে যাতে তারা থানায় গিয়ে এফআইআর না করে। এ বিষয়ে পুলিশও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই সন্ত্রাস? যদি গভীরে গিয়ে চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যাবে তৃণমূল জিতে গিয়েও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ তারা ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখেছে যতই প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দ্বারা বিজেপি হেরেছে বলে শোরগোল তোলা হচ্ছে, বিজেপি কিন্তু হারেনি। ২০১৬ সালের তুলনায় প্রায় ২৬ গুণ সিট বাড়িয়েছে। ৩টি থেকে ৭৭টি। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলতেন যেহেতু কংগ্রেস দুর্নীতি যুক্ত, সেজন্য কংগ্রেস মুক্ত ভারত গঠন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সেটা করে দেখিয়েছে। শুধু কংগ্রেস মুক্ত নয় কমিউনিস্ট মুক্ত হয়েছে। ৩৪ বছর ক্ষমতা ভোগকারী কমিউনিস্ট আজ শূন্যে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর কেন এই অত্যাচার? সঙ্ঘ তো নির্বাচনে দাঁড়ায়নি। মিছিল মিটিং করেনি। সঙ্ঘের ব্যানারে বিজেপির সমর্থনে কোনো পথসভা হয়নি। ইলেকশন কমিশনের কাছে আরটিআই-এর মাধ্যমে জানা যাবে যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল কিনা। তবে এই রোষ কেন? সঙ্ঘ এই নির্বাচনে কী করেছে? একজন সচেতন নাগরিকদের কাজ বা দায়িত্ব পালন করেছে। স্বয়ংসেবকেরা পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত জনজাগরণের জন্য

দ্বারে দ্বারে গেছে চারটি কথা নিয়ে। আবেদন রেখেছে ভোটারদের কাছে 'নিজের ভোট নিজে দিন, সকাল সকাল ভোট দিন' (প্রথমে ভোটদান পরে জলপান), নোটাতে ভোট দেবেন না। শত প্রতি শত ভোট দিন।' এটা আসলে নির্বাচন কমিশনের কাজে স্বয়ংসেবকেরা সাহায্য করেছে। কোথাও বলেনি বিজেপি-কে ভোট দিন। তবুও স্বয়ংসেবকদের ওপর আক্রমণ কেন?

যদি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে ১৯৩৯ সালের বর্ষপ্রতিপদ তিথিতে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজের শুরু। তারপর থেকে বিভিন্ন কারণে সঙ্ঘকাজের বিরোধিতা করা হয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্বে তৎকালীন সরকার সঙ্ঘ বিরোধিতা করেছিল, কারণ স্বয়ংসেবকেরা দেশের শৃঙ্খলমোচনের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল বলে।

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস চেয়েছিল তাদের সেবাদলের সঙ্গে সঙ্ঘ মিশে যাক, কিন্তু তখন শ্রীগুরুজীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কংগ্রেসের ইচ্ছাপূরণ হয়নি। ফলে ১৯৪৮ সালে মহাত্মাজীর হত্যার দায় সঙ্ঘের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। ফলে ১৯৪৮-এর ১ ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসি গুন্ডারা শ্রীগুরুজীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে গুরুজীর বাড়ি আক্রমণ করে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হলো। পশ্চিমবঙ্গেও স্বয়ংসেবকদের উপর নানারকম অত্যাচার চলল। পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা হলো। বহু স্বয়ংসেবকের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বহু স্বয়ংসেবককে নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। কিন্তু স্বয়ংসেবকদের দৃঢ় আদর্শবাদের জন্য ও বহুসংখ্যায় সত্যাগ্রহ করার জন্য এবং ন্যায়ালয়ের রায়ে পরিষ্কার হলো যে গান্ধীহত্যার সঙ্গে সঙ্ঘ এবং স্বয়ংসেবকেরা কোনোমতেই যুক্ত নয়। সুতরাং সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল। কিন্তু কংগ্রেসের সেই রাগ রয়ে গেল। ফলে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় আবার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হলো। তখনও লক্ষাধিক স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করে জেলে গেলেন। ২ বছর বাদে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলতে বাধ্য হয়।

এরপর এলো কমিউনিস্ট জমানা। যারা জরুরি অবস্থার সময় আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল, স্বয়ংসেবকদের লড়াইকে হাতিয়ার করে যারা ক্ষমতায় এলো তারাও সঙ্ঘের বিরোধিতা করতে লাগল। কারণ ভারতের কমিউনিস্টরা জন্মলগ্ন থেকে হিন্দুবিরোধী। আর সঙ্ঘ হিন্দুত্বের কথা বলে এবং হিন্দুসংগঠন করে। তাই কাজের সময় কাজি কাজ ফুরালেই পাজি নীতি অবলম্বন করে সঙ্ঘবিরোধিতা করে গেল। তারপর তৃণমূল জমানায় মুসলমান তোষণের জন্য সঙ্ঘবিরোধিতা। না হলে বর্তমান মন্ত্রীসভার জনৈক মন্ত্রী কেশব ভবনে এই সেদিনও এসেছিলেন। তখন কেশব ভবনের কার্যকর্তাদের সাদা পোশাকের সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন তিনি এখন রাজনীতির ময়দানে এসে বলেছেন সঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক। আসলে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘ চিরকাল বিরোধিতার মধ্যে, অপপ্রচারের মধ্যে দিয়ে বিস্তার হয়েছে। সরকার বিরোধিতা করেছে কিন্তু জনগণ সঙ্ঘকে মনের মধ্যে স্থান দিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এ শ্রীগুরুজীকে খুন করার জন্য যখন কংগ্রেসি গুন্ডারা এসেছিল তখন সংবাদ পেয়ে স্বয়ংসেবকেরা দণ্ড নিয়ে হাজির হয়েছিল। তখন গুরুজী বলেছিলেন যারা আমাকে মারতে এসেছে তাদের তোমরা আঘাত করো না, কারণ আজ এরা বিরোধিতা করছে কাল এরাই সহকর্মী হবে। আজ এরা সঙ্ঘকে গালিগালাজ করছে কাল এরাই স্তুতি বন্দনা করবে। সেই ঋষিবাক্য সত্যে পরিণত হয়েছিল। প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণজী থেকে শুরু করে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখার্জি পর্যন্ত এককালে সঙ্ঘ বিরোধিতা করেছেন তাঁরাই পরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে সঙ্ঘকে সাত হাত মাটির তলায় পুঁতে দিয়েছি তিনিই আবার তাঁর মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীদের উপদেশ দিয়েছেন যে স্বয়ংসেবকদের কাছ থেকে সেবা কাজ শিখুন।

সংগঠন হিসেবে দেখলে দেখা যাবে ভারতে সঙ্ঘের আগে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু আজ যদি তুলনা করি তবে দেখা যাবে তারা বর্তমানে Microscopic আর তিন তিনটি নিষেধাজ্ঞা সামলেও সঙ্ঘ বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক সংগঠন। এটা একদিনে হয়নি। যখন তারা ক্ষমতার অধিকারের জন্য রাজনীতি করেছে তখন সঙ্ঘ সংগঠন তৈরির কাজে নিমগ্ন থেকেছে। দীর্ঘ ৯৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা, হাজার হাজার স্বয়ংসেবকদের আত্মত্যাগ, লোকান্তে সেবা— এই সবের মধ্যে দিয়েই সঙ্ঘ জনমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ৯৬ বছর ধরে সঙ্ঘ শুধু ব্যক্তি নির্মাণ করেছে, সংস্কার যুক্ত মানুষ তৈরি করেছে। সেই সংস্কারিত ব্যক্তি সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে সঙ্ঘকে সর্বব্যাপী সর্বস্পর্শী করে তুলেছে। স্বয়ংসেবকেরা যে কাজ হাতে নিয়েছে তাকেই সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। কণ্টকাকীর্ণ পথকে সুগম করে তুলেছে।

তাই হতাশ হওয়ার কিছু নেই। নিজেদের মধ্যে মান- অভিমানের সময় নেই। এ রাজ্যের স্বয়ংসেবকেরা অনুকূল পরিস্থিতির স্বাদ কোনোদিন পায়নি, প্রতিকূলতাকেই সঙ্গী করে পথ চলেছে। এতগুলি অন্ধকার রাত্রি পার হয়েছে তাই অন্ধকারে পথ চলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেই জন্য আবার কোমর বাঁধতে হবে। জেলায় জেলায় অত্যাচারিত, নিপীড়িত স্বয়ংসবকদের পাশে পরিবারের সদস্যের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। বিপদের দিনে পুরোনো স্বয়ংসেবকেরা বারবার এগিয়ে এসে সাহায্য করেছে। প্রবীণ ও নবীনরা একসঙ্গে মিলে মানুষদের হতাশা, ক্ষোভ, অভিমান কাটিয়ে কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তবেই অন্ধকার কাটবে। রাত্রি ঘন হয়েছে মানে সূর্যোদয় আসন্ন। আসুন, সবাই মিলে সেই গৈরিক সূর্যকে বরণ করার জন্য তৈরি হই।

## নদীর নাম সাবরমতী

সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মতো বড়ো না হলেও অববাহিকার আয়তনে সাবরমতী বড়ো নদীর মধ্যেই পড়ে। ৩৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ সাবরমতীর উৎস রাজস্থানের আরাবল্লী পাহাড়ে। উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে গুজরাটের পুরনো রাজধানী আমেদাবাদ, বিখ্যাত সাবরমতী আশ্রম, বর্তমান রাজধানী গান্ধীনগর হয়ে সবুজ সমভূমি পেরিয়ে আরব সাগরের কাম্বে উপসাগরে মিশেছে। উল্লেখ্য, সাবরমতীর অন্যতম উপনদী হচ্ছে হাতিমতী। যে নদীর তটভূমিতে হাতি দেখা যেত বা তার নাম হাতিমতী।

ভারতীয় পুরাণে সাবরমতী 'সাভ্রমতী' নামে পরিচিত ছিল। মৃগের এক প্রজাতির সংস্কৃত নাম সাম্ভ্র। এই 'সাম্ভ্র' উচ্চারণ বিবর্তনে হয়েছে সাম্ভর-সাভর-সাবর। এখন বলা যায়, যে নদীর তটভূমিতে সাম্ভ্র মানে সাবর প্রজাতির মৃগ দেখা যেত তার নাম সাবরমতী হয়ে যায়। বিষয়টি সংক্ষেপে নিম্নভাগে লেখা যায়। সাম্ভ্রমতী-সাভ্রমতী-সাভরমতী-সাবরমতী।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

## মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,

গত ১ জুন প্রেস কনফারেন্সে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আপনার কাতর আবেদন শুনে বড়োই বিস্মিত হলাম। একুশের নির্বাচন এক পায়ে জয় করার পরের দিনই আপনার দলের সাংসদ আমেরিকার সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমসে মোদীবাবুকে তীব্র ভৎর্সনা করে লিখে ফেললেন মোদীকে কীভাবে হারাতে হবে তা তিনি জানেন— তারপরে আপনি কিনা বলছেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য বহিরাগত মোদীর পায়ে ধরবেন! কিন্তু তার কি সত্যিই কোনো প্রয়োজন আছে?

২০১৬ সাল থেকে আজ অবধি, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে লজিস্টিক হাব নির্মাণের জন্য কত টাকা দিয়েছে একবার দেখে নেওয়া যাক : গভীর সমুদ্র বন্দর ৪০,০০০ কোটি টাকা, লুধিয়ানা-কলকাতা পণ্য করিডোর ১৫,০০০ কোটি টাকা, হাওড়া-মুম্বই পণ্য করিডোর ১০,০০০ কোটি টাকা, ১০০ কিলোমিটার মেট্রো প্রকল্প ২৫,০০০ কোটি টাকা, এছাড়াও গত বছরের বাজেটে ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর এবং ডানকুনি লুধিয়ানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর এর জন্য ২৫,০০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি অবিলম্বে চালু না করলে আমাদের রাজ্যের মানুষকে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবেই জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু আপনার ভুল জমিনীতি ও অর্থনীতির ফাঁসে সব আটকে আছে, বঞ্চিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক। শিল্প আনা তো দূরের কথা, ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেই এসইজেড বন্ধ করলেন। ফলে রপ্তানিমূলক শিল্পের রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, সফটওয়্যার, আইটি, আইটিইএস এবং বিভিন্ন উচ্চপ্রযুক্তির শিল্প। রাজ্যে কোনো চার লেন রাজ্য সড়ক নেই। জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ সেতু ১০ বছর এক কাঠা জমির জটে আটকে ১২ বছর! ২০১১ সালে আপনি ক্ষমতায় আসার পরে যে জায়গাতে ফিনান্সিয়াল হওয়ার কথা হয়েছিল সেখানে গড়ে উঠেছে একটি মোমের মূর্তির মিউজিয়াম, যে মিউজিয়ামে উত্তম কুমারের মূর্তি দেখে অনেকে সংজ্ঞা হারিয়েছে বলে শোনা যায়। তার মানে, না শিল্প না পরিকাঠামো। ঘটা করে অনেক 'মৌ' স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু রাজ্যের মানুষের কাছে শিল্পের 'মোয়া' এখনো অধরা। যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ইপিএ-২ কেন্দ্রীয় সরকার ছেড়েছিলেন, সেই এফডিআই-তে এই বছর আমাদের দেশ রেকর্ড তৈরি করেছে, শীর্ষে সেই গুজরাট আর আমাদের কপালে জুটেছে শুধুই আলুর চপ! এর জন্য কি বহিরাগত মোদী দায়ী? এফডিআই-তে আপনার অসুবিধা কী? তাহলে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন কেন? এফডিআই এলে আমরা মুম্বই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদের মতো ভালো মাইনের চাকরি পেলে আপনার ক্ষতিটা কোথায়?

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ উত্তরপ্রদেশে প্রতিদিন টেস্টিং-এর সংখ্যা গড়ে প্রায় ৩ লক্ষের বেশি সেখানে পশ্চিমবঙ্গে কোনওক্রমে ৭০ হাজার। গত এক সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশে সঠিক পারসেন্টেজ মানে প্রতি ১০০ জনের টেস্টিং করালে মোটামুটি ২ শতাংশ করোনা পজেটিভ ধরা পড়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০-২৫ শতাংশের উর্ধ্বে। নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে তড়িঘড়ি লকডাউন ডাকলেন। ভোটের আগে ৫ টাকায় ডিম-ভাত দেওয়ার জন্য 'মা প্রকল্প' চালু করেছিলেন এই লকডাউনে এর মধ্যে কটা মা প্রকল্প রাজ্যে চলছে একটু বলতে পারবেন? জানুয়ারি মাসে পিএম কেয়ার ফান্ড থেকে আমাদের রাজ্যকে পাঁচটি অক্সিজেন প্লান্ট নির্মাণ করার জন্য টাকা দেওয়া হয়— কতগুলি প্লান্ট আপনি নির্মাণ করেছেন একটু জানাবেন? যে কলকাতা একসময় ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের অষুধ বানিয়ে মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল, সেই কলকাতা এই করোনা অতিমারীতে না আবিষ্কার করলো কোনো ভ্যাকসিন বা ওষুধ, না উৎপাদন করলো কোনো কিছু! শুধু অন্যের ছিদ্র খুঁজে বেড়ানো আর কত অধঃপতন আমরা দেখবো?

আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য উত্তর প্রদেশ বা অসম। এই অসমে প্রায় ১ লক্ষের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে। আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েদেরকে ন্যায্য চাকরির দাবিতে অনশনে বসে পুলিশের মার খেতে হয়। দুর্নীতিতে যে সীমাহীন নিয়োগ হয়েছে তা মহামান্য হাইকোর্টের রায় দেখলেই বোঝা যায়। আর আপনি শুধুমাত্র সিভিক কর্মচারী নিয়োগ করে নিজের দলের ক্যাডার বাড়িয়ে গেছেন।

গত ১০ বছরের আপনার শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের ঋণের বোঝা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। রাজ্যে শিল্পায়নের কোনো পরিকল্পনা নেই! কেন্দ্রীয় বঞ্চনা তত্ত্বের যে রাজনীতি জ্যোতিবাবু প্রবর্তন করেছিলেন আপনি সেই পথে হেঁটে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত বর্তমানে এক অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আপনি নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে

থাকবেন কিন্তু আমাদের কী হবে? দেশ যখন দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সময়ে নেহরুভিয়ান মিশ্র অর্থনীতি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে দেশের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও। মাত্র একবার জোট সরকার চালানোর সুযোগ পেয়ে অটলবিহারি বাজপেয়ী যে কাজ করে করেছিলেন তার জন্য তিনি আজও স্মরণীয়। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নাম আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। জ্যোতিবাবু ২৪ বছর রাজত্ব করে গেছেন ঠিকই কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়েও জ্যোতিবাবুকে মানুষ পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংসের কারিগর হিসেবে মনে রেখেছে। ভবিষ্যতে মানুষ আপনাকে কী হিসেবে মনে রাখবে সেই দায়িত্ব আপনারাই হাতে রয়েছে। দয়া করে কেন্দ্র বিরোধিতার এই সংকীর্ণ রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে আসুন।

তবে সংকীর্ণ রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে আর কী হবে? গত ৪৪ বছরের ক্রমাগত মধ্যমেধায় পরিণত হওয়া রাজ্য তো এই রাজনীতিই চায়। ১৯৬৭-তে আমেরিকা হঠাৎ গম পাঠানো বন্ধ করায় মুখ ফস্কে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও সততার প্রতীক প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলে ফেলেছিলেন, 'তোমরা কাঁচকলা খাও'। সেদিনের বাঙ্গালি ফেটে পড়েছিল রাগে, প্রফুল্লবাবু হেরে যান। আজ আপনি যখন সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার আমলাদের নির্দেশ দিলেন বাঙ্গালিকে যশ সাইক্লোনে মরে যাওয়া মাছ ভেজে খাইয়ে দিতে, বাঙ্গালি মুখ বুজে সেই বাণী মেনে নিল। সত্যেন বোস, জগদীশ বোস, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহাদের বাঙ্গালিকে মেরুদণ্ডহীন পরিণত করতে এবং আপনার কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য আপনার পূর্বসূরি জ্যোতিবাবুকে কিন্তু একবার ধন্যবাদ দিতেই হবে। উনি শুধু টেস্ট টিউব বেবির আবিষ্কর্তা ডাঃ সুভাষ মুখার্জিকে শ্রেণীশত্রু বিনাশের তালিকায় রাখেননি, পুরো জাতটাকে গণশক্তির যন্তরমন্তর ঘরে ঢুকিয়ে আপনার কাজ সহজ করে দিয়েছে।

**—রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জি,**
গবেষক, আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়,
কানাডা।

## এই মুহূর্তে উপনির্বাচন হওয়া অনুচিত

কোভিড ১৯-এর ভয়াবহতার জন্য পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। খুব ভালো কথা।

তাহলে এবার পশ্চিমবঙ্গে যে ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা তাও যেন অবিলম্বে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

গত বিধানসভা ভোটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে করোনার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে (এটা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির অভিযোগ। তাহলে উপনির্বাচনও করোনার বৃদ্ধি ঘটাবে। তাই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ, উক্ত ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন করে পশ্চিমবঙ্গকে যেন নতুন করে পুনরায় করোনার দিকে নিক্ষেপ করা না হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, তৃণমূল কংগ্রেস ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করেছে। নির্বাচনের জন্য তাগিদটা তৃণমূল কংগ্রেসেরই বেশি। এটাই স্বাভাবিক। এবার বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জি পরাজিত হয়েছেন। সংবিধানের সৌজন্যে তিনি হেরেও মুখ্যমন্ত্রী। তবে ছয় মাসের জন্য। এই ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে যে কোনো একটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। আর তা না পারলে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ খোয়া যাবে। আর এই ছয় মাস শেষ হচ্ছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। আর বর্তমানে এই অতিমারী সংকটে ভোট হওয়াও সম্ভব নয়। কারণ মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, সুতরাং উপনির্বাচন এই মুহূর্তে স্থগিত করা উচিত।

উক্ত ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে বাইশ সালের এপ্রিল মে মাসের দিকেও উপনির্বাচন করা যেতে পারে যদি করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে তবেই।

পরীক্ষার থেকে জীবন বড়ো— একদম সত্যি কথা। তেমনি সংবিধানের থেকেও মানুষের জীবনের মূল্য অনেক অনেক বেশি। এটাও কমিশন বা আইনকে মাথায় রাখতে হবে।

**—নরেশ মল্লিক,**
জমালপুর, পূর্বস্থলী-২, পূর্ব বর্ধমান।

## বাঙ্গলার বুদ্ধিজীবীদের ঘুমিয়ে থাকার ভাব কবে কাটবে?

এক সময় গোধরা কাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন চ্যানেলে, প্রিন্ট মিডিয়া যেভাবে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করে এক প্রপাগাণ্ডা করেছিল, তা মুসলমান সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক রূপে গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগণের নিরপেক্ষতার শিরদাঁড়াটি যথেষ্ট ভাবে চিরদিনের জন্য ভারতবিদ্বেষী হয়ে যায়। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, কলমচির পক্ষে তা যথেষ্টই ছিল। পরবর্তীকালে আমরা তসলিমার নির্বাসন নিয়ে, পেশাদার বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগণ তখন শ্মশানেপ নীরবতা পালন করে প্রমাণ করে যে, তাদের বাঁকানো শিরদাঁড়া, সেদিনও সোজা যেমন হয়নি, তেমনি আজও। এ রাজ্যের বুকে ভোট পরবর্তী সময়ে যেভাবে নৃশংস হিন্দু নিধন যজ্ঞ হলো, শুধুমাত্র মুসলমান প্রেমিক শাসকদলকে ভোট না দেওয়ার জন্য, তা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এই কসাইয়ের দায়িত্ব পালন করেছিল প্রধানত যারা, তারা হলো কেউ-বা রোহিঙ্গা, কেউ-বা উগ্রপন্থী, কেউ-বা জেহাদি। রাজ্যে এহেন ধ্বংসাত্মক কাজে রাজ্যপাল বিচলিত হয়ে, বিবেকের তাড়নায় তাড়িত হয়ে সরজমিনে যেতে বাধ্য হন, যা অনেক বুদ্ধিজীবী থেকে রাজনীতিবিদদের মনপসন্দ হয়নি। বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীগণের মুখে লোহার তালা, যা রুণালায়নার গানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ তালার চাবি কার কার কাছে আছে, তা তো সবারই জানা। এ অমানিশা কেটে যাবে, ভোর হবে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের ঘুমিয়ে থাকা ভাব কবে কাটবে।

**—রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

# কীর্তনীয়া কৃষ্ণভামিনী

**শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে**

সেকালের কলকাতা। লর্ড কর্নওয়ালিসের পার্সানেন্ট সেটেলমেন্ট সারাদেশে এক নব্য সামন্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল— যাদের বলা হয় জমিদার। এই জমিদার শ্রেণীর উত্থানে সারা পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন কালচার বয়ে এনেছিল যাকে তৎকালীন সমাজ বাবুকালচার নামে অভিহিত করেছিল। বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত ওইসব সামন্ত প্রভুরা মজুরা, ঠুমরী, বাইজিনাচ থেকে শুরু করে ভারতীয় সংগীত নৃত্যকলার যেমন পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তেমনি প্রজাদের উপর শোষণও চালাতেন। তাদেরকে কেন্দ্র করেই কলকাতা তথা সারা বঙ্গে শিল্পীরা এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে এস ওয়াজেদ আলি শাহ-এর নাম যেমন এসে পড়ে তেমনি এসে পড়ে অসামান্য গুণী শিল্পী গহরজানের কথা।

বাঙ্গলার অতি প্রাচীন এক লোকসংগীত হলো কীর্তন গান। এই কীর্তন বাঙ্গলার অন্যতম সংগীতালেখ্য। মূলত ভক্তিরসের পালা। দোহার পত্র সহকারে এই গান গাওয়া হয়। হারমোনিয়াম, করতাল ও মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল-এর প্রধান বাদ্যযন্ত্র। রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে রাধা-কৃষ্ণের বিভিন্ন পর্যায়ের লীলা বিষয়ক ও গৌরতত্ত্বের ভাবধারী এবং তৎসহ হিন্দু শাস্ত্রের পুরাণাদি ও নানা কাহিনি- উপকাহিনি সংশ্লিষ্ট আখ্যান ও তত্ত্বই এই গানের বিষয় বস্তু। পূর্বরাগ, অনুরাগ ও শৃঙ্গার এই তিন রসেই কীর্তন সম্পৃক্ত ছিল। বর্তমানে অন্যান্য লোকসংগীতের মতো এ গানও অবলুপ্তির পথে। তবে গ্রাম বাঙ্গলায় আজও এ গান বিভিন্ন পূজাপার্বণে, বাড়ির কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনোরকমে বেঁচেবর্তে আছে। এই পদাবলী কীর্তন পালাগান পরিবেশন করতে করতে শিল্পীরা কৃষ্ণ-ধাধা ও গৌর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন এবং শ্রোতাদেরও মাতোয়ারা করে তুলতেন। পশ্চিমবঙ্গে বহু কীর্তনীয়া এই গান পরিবেশন করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ এই গানের বিশিষ্ট পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম।

একথা বলাই বাহুল্য যে তৎকালে বিশেষ করে মহিলা কীর্তনীয়াদের কোনো না কোনো বাবু ধরা থাকতো। যারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই পড়েন। ওই সমস্ত নব্য বাবুমশাইরা ওই সমস্ত কীর্তনীয়াদের যেমন পৃষ্টপোষকতা করেছেন, গুণের কদর করেছেন, তেমনি আবার প্রয়োজন মতো তাদের ভোগ লালসায় সম্ভোগও করেছেন। শিল্পীরা প্রায়শই ভোগ লালসার শিকার হতেন অনেকটা বাধ্য হয়েই। কিন্তু এই সম্ভোগ ও ভোগলালসাকে তারা শৃঙ্গার রস বলে চালাবার চেষ্টা করতেন। কৃষ্ণভামিনী এরকমই একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া, যার নাম খ্যাতি কালনা, কাটোয়া, বর্ধমান, নদীয়া, নবদ্বীপ, রামপুর হাট, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু ভক্তের মনোরঞ্জন করেছিল বর্ধমানের এঁদোগলির মালিপাড়ার এই গায়িকা। মথুর ভট্টাচার্য নামে এক জমিদার এই কীর্তনীয়ার আখড়ায় আকচার যাতায়াত করতেন। তেমনি সমাজের উঁচুমাথা হবার কারণে রসিক হিসেবে কৃষ্ণভামিনীর বিভিন্ন আসরে তার ছিল অবাধ বিচরণ। বিভিন্ন সময়ে নানা উপহার উপঢৌকনে তিনি কৃষ্ণভামিনীর মন জয় করতেও পেরেছিলেন। যৌবনে যেমন তিনি কৃষ্ণভামিনীর অনুরাগী ছিলেন, তেমনি অন্য কোনো পুরুষকে তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেননি। কৃষ্ণ ভামিনীও তার প্রতি শুধুমাত্র দেহ লালসায় তার কাছে আসতেন না, আসতেন কৃষ্ণভক্ত হিসেবেও। রসিক হিসেবে তিনি ছিলেন একেবারে পাক্কা। মাঝ বয়সে যখন কৃষ্ণভামিনীর কণ্ঠ আর সেভাবে সাথ দেয় না, তখন এই মথুরবাবুর আদেশেই কৃষ্ণভামিনী আসরের নাড়া তুলে দেয় তারই পালিতা কন্যা রাধার কাঁধে, যাকে সে একদিন পরম নিষ্ঠায় কীর্তন শিক্ষা দিয়েছিল। রাধাও বিভিন্ন আসরে আসরে কীর্তন পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধই করে না, তার সুনাম প্রায় কৃষ্ণভামিনীকেও ছাপিয়ে যায়।

এদিকে মথুরবাবুর দৃষ্টি তখন পড়েছে রাধার দিকে। মথুরবাবু স্পষ্টতই কৃষ্ণভামিনীকে জানিয়ে দেয় যে রাধাকে তার চাই এবং

তার জন্য সে বাগানবাড়িও ঠিক করে রেখেছে। এবং কৃষ্ণভামিনীকেও তার বাগানবাড়িতে আশ্রিতা হয়ে থাকার প্রস্তাব দেয়। বিনিময়ে রাধাকে তার হাতে তুলে দিতে হবে। প্রচুর টাকার প্রলোভনও দেখায়। কিন্তু কৃষ্ণভামিনী সেই প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না, স্পষ্টই বলে— আমি মালিপাড়া থেকে কোথায়ও যেতে পারবো না।

—কেন? মালিপাড়ায় থেকে তোমার কোন সিদ্ধিটা হবে শুনি।

—এই মালিপাড়ার জানলার গরাদে দাঁড়িয়ে আমি এখনও অপেক্ষা করে থাকবো তার জন্য, সে একদিন ভালোবেসে আমায় সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে কৃষ্ণভামিনীর নিজস্ব খোলঞ্চী গগন, সে পেশায় রিক্সাওয়ালা, কৃষ্ণভামিনীকে মনে মনে ভালোবাসে। কিন্তু সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের কারণে কৃষ্ণভামিনী তাকে আমলই দেয় না, বরং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যই করে। হায়রে বুদ্ধিহীন মানব! হৃদয় ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না। প্রত্যাখ্যাত হলেও গগন তাকে ভালোবেসেই যায়। কিন্তু মথুরবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। গগন যেদিন মথুরবাবুর প্রস্তাবের কথা জানতে পারে, তখন একদিন রাতে এসে কৃষ্ণভামিনীকে জিজ্ঞেস করে—

—তুমি কি মথুরবাবুর প্রস্তাব মেনে নিলে?

—সেটা আমার ব্যাপার, একটা রিক্সওয়ালার কাছে আমি সে কৈফিয়ত দেব না।

বড়ো কষ্ট পায় গগন। অভিমানে সে দল ছেড়ে রিক্সা টানতে চলে যায়। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীকে বিপদে ফেলতে চায় না, তাই সে একজন বিকল্প খোলঞ্চী বংশীকে ঠিক করে দিয়ে যায়। কৃষ্ণভামিনী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। চিৎকার করে বলে—

—এসব ন্যাকামি আমি বরদাস্ত করবো না, তোমার যাওয়া চলবে না।

—আমার পয়সার টান পড়েছে, আবার রিক্সা টানতে হবে।

—তবে আমার কাছ থেকে পয়সা নাও, এতোদিন বাজাচ্ছো তোমারও কিছু পাওনা তো হয়েইছে।

—সে আমি কিছুতেই নিতে পারবো না।

—তবে আমি কি করবো? আমি খোলঞ্চী পাব কোথায়? সমস্ত জায়গায় বায়না নেওয়া আছে, আমার আসরের কী হবে?

—বংশী ঠিক কাজ চালিয়ে দেবে।

—কাজ চালিয়ে দেবে মানে? ও কি আমার সঙ্গে কোনোদিন বাজিয়েছে? ন্যাকামি বন্ধ করো।

—আমি আর পারছি না, এবারে আমি ছুটি চাই।

—ছুটি? ছুটি দেখাচ্ছি, এখান থেকে এক-পাও নড়তে পারবে না, ফল ভালো হবে না বলে দিলুম।

রাগে, ক্ষোভে, দুঃশ্চিন্তায় কৃষ্ণভামিনী অবসন্ন হয়ে পড়ে। গগন কিন্তু চলেই যায়। কৃষ্ণভামিনী তবুও আঁচ করতে পারে না গগনের অভিমানের কথা। ফলে বংশীকেই আসরে আসরে বাজাতে হয়। বংশী ভালো ভাবেই কাজ চালিয়ে দেয়। এদিকে মথুরবাবুর আদেশে যখন কৃষ্ণভামিনী বসে যায় তখন রাধাই মূল গায়িকা। রাধার সঙ্গে সঙ্গত করে চলে আসর থেকে আসরে এক ধরনের ক্ষ্যাপা বংশী।

বংশী পাগলের মতো তন্ময় হয়ে খোল বাজায়। রাধা মুগ্ধ হয়। রাধা গানের মাঝে বিভিন্ন তাল কর্তব করে বংশীকে খোল বাজানোর কসরত দেখাতে সাহায্য করে চলে। ধীরে ধীরে রাধা আর বংশী পরস্পরের কাছাকাছি হয়। ওদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্যাপারটা কৃষ্ণভামিনীর নজরে আসতেই বংশীকেই একরকম তাড়িয়েই দেয়। রাধা তখন ফুঁসে ওঠে। কারণ রাধা তখন বংশীর সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর। একদিন বাধ্য হয়েই কৃষ্ণভামিনীকে ডেকে বলে—

—মাসি আমার এ জীবন ভালো লাগছে না।

—ভালো লাগছে না মানে?

—ভালো লাগছে না মানে, আমি আর এখানে থাকবো না; জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে আমার।

—ওকি কথা মা! আসরে আসরে শ্রোতাদের মনজয় করছিস, কত নাম যশ হচ্ছে, এসব তোর ভালো লাগছে না? ওরে রেকর্ড বাইস্কোপের যুগে মানুষ যে আসরে আসরে বসে এখনও আমাদের গান শুনছে এটা কী কম কথা রে।

—ওরা আমার গানের যত না কদর করে তার চেয়ে বেশি আমার দিকে হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকে। আমার যৌবনকে ওরা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। আমার সারা শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। মাসি এটা কি একটা জীবন বলো?

—এসব কী বলছিস, এসব বলতে নেই মা। ওনারা হলেন মহাজন, ওনারা ভক্ত শ্রোতা, আমাদের কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

—তবে তুমি ওই নারায়ণদের নিয়েই থাকো, অমি চললুম।

—চললি মানে? কোথায় যাবি?

—আমি বংশীর কাছেই চলে যাব।

—ওই বাউন্ডুলে ছোড়াটার কাছে? বল ও তোকে কি লোভ দেখিয়েছে? আমার প্রথমেই আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। চাল নেই, চুলো নেই, ওর কাছে কী পাবি? কী আছে ওর?

—ওর কাছে আনন্দ আছে।

—আনন্দের কী বুঝিস তুই? আনন্দ আর ফুর্তির তফাত বুঝিস? দুদিন পরে যখন আস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে যাবে তখন কোথায় যাবি? বারো ভাতারি কপালে লেখা আছে, বলে দিলুম।

—যেখানেই যাই তোমার কাছে আর ছুটে আসবো না মাসি।

—বড্ড বড়ো বড়ো কথা শিখেছিস্ তো তুই, ওই বংশী ছোড়াটার শেখানো, না?

—আমি ওকে খুঁজে বার করবোই। তুমি আর আটকাতে পারবে না।

—মা গো মা! দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম। সারাজীবন দায়িত্ব নিয়ে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম তার এই প্রতিদান?

—দায়িত্ব নিতে কে বলেছিল? কেন আমায় গান শিখিয়েছিলে? বসে বসে সুদ খাবে বলে?

—মা গো মা! কী বুলি ফুটেছে দেখ। এমনি এমনি বড়ো হয়ে

যাওনি, তোর মা আমার কোলে রেখে মরে গেল, আমি দায়িত্ব এড়াতে পারিনি। কেউকে না কেউকে দায়িত্ব নিতে হয়। আর গান ছাড়া তোকে আর কিছু দেবার মতো ছিল না আমার।

—তারপর তোমার শেষ ইচ্ছা কী? ওই মথুরবাবুর হাতে তুলে দেবে, এই তো?

—কী বললি মাগি? এতো বড়ো কথাটা আমায় বলতে পারলি? যা, তুই চলে যা, যেখানে খুশি চলে যা।

শেষে বংশীই একদিন খুঁজতে খুঁজতে মালিপাড়ায় এসে হাজির হয়। এসে রাধার খোঁজ করতেই সন্ধান পেয়ে যায়। ওরা গোপনে সাক্ষাৎ করে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে দুজনে পালিয়ে যায় দূরে, অনেক দূরে; পাহাড় ঝরনা পেরিয়ে ওরা কোন অজানায় পাড়ি দেয়, কে তার খবর রাখে।

এদিকে রাধাকে পাবার আশায় বুক বেঁধে মথুরবাবু মালিপাড়ায় এসে যখন জানতে পারে রাধা আর সেখানে নেই তখন তার স্বরূপ বের হয়ে পড়ে। এতোদিনকার সম্পর্ক মুহূর্তে চুকিয়ে দিয়ে কৃষ্ণভামিনীকে হুমকি দিয়ে বলে—

—যেখানেই যাক আমি রাধাকে খুঁজে বার করবই। কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকী কেষ্ট, তুমিও না। রাধা আমার, আমার ভাগে যে ভাগ বসিয়েছে তাকে আমি ছাড়বো না। কেষ্ট; তুমি হয়তো আমাকে দিয়েছো অনেক, কিন্তু রাধাকে পালিয়ে যেতে দিয়ে তুমি তা কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দিলে। আমার বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল।

—ভট্টাচার্যমশাই রাধা আমার কারণ না শুনে পালিয়ে গিয়েছে, তা জেনেও সব দায় আপনি আমার ঘাড়েই চাপালেন। রাধার ডানা গজিয়েছে ও কেন আর আমার কাছে থাকবে বলুন। চারিদিকে ওর কত নাম যশ হয়েছে শ্রোতারা ওর রূপে গুণে মুগ্ধ। ও কেন এই বুড়ি মাসিকে নিয়ে পড়ে থাকবে? আমি বংশী ছোড়াটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ও তাতেই রণচণ্ডী হয়ে গেল, বলে গেল আমার কাছে আনন্দ নেই। এ জীবন ও বইতে পারছে না। তাই আনন্দ খুঁজতে বেরিয়ে গেল ওই ছোড়াটার হাত ধরে।

—কী? একটা তিন পয়সার খোলঞ্চীর সঙ্গে? আনন্দ দেখাচ্ছি।

—ভট্টাচার্যমশাই একটা ছোট্ট ভুলে আমার এমন অপরাধ হয়ে গেল আপনি সব সম্পর্ক চুকিয়ে বুকিয়ে চলে যাচ্ছেন। আপনি আমাকে ভুলে যেতে পারলেও আমি কিন্তু আপনাকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

—যদি জানতে কেষ্ট, আমি এর মধ্যে শুধু রাধার জন্য কতটাকা ইনভেস্ট করে ফেলেছি, তাহলে আর এসব কথা আর বলতে না। শুধু আমার ক্ষতি হলো না আমার নবদ্বীপেরও বড়ো ক্ষতি হয়ে গেল। তুমি যদি প্রথমেই আমার কথাটা শুনতে তাহলে এদিনটা আমায় আর দেখতে হতো না।

—আজ এই পড়ন্ত বেলায় আপনার কেষ্ট আপনার কাছে একটা মিনতি জানাচ্ছে, রাখবেন?

—শুধু মিনতি কেন? আদেশ আবদার করতে পারতে, আমি তোমাকেই সেই অধিকার দিয়েছিলাম, তুমি তা নিজের দোষে হারিয়েছ কেষ্ট।

—বলছি; কাল দোল। আজকের দিনটা থেকে যান, আপনার জন্য সিদ্ধি বেটেছি, তাতে আপনার পছন্দের গন্ধও দিয়েছি যেমন প্রতিবছর দিয়ে থাকি, তাই মিনতি করছি যদি আজকের রাতটা—

—থাক কেষ্ট থাক, মিথ্যার পিচকারি দিয়ে বাহারি আতর নাই-বা ছড়ালে।

—মাপ করবেন ভট্টাচার্যমশাই, এতো বড়ো অপবাদ দেবেন না। কৃষ্ণভামিনী কখনও আপনার সঙ্গে কোনো তঞ্চকতা করেনি। আপনি যেমন আপনার কেষ্টকে ভালোবেসেছিলেন তেমনি আমিও আপনাকে রসিক মহাজন বলে অন্তরে স্থান দিয়েছি। যে জায়গা থেকে কখনও আপনাকে সরাতে পারবো না। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন আপনার ঋণ শোধ করা আমার এ জীবনে সম্ভব নয়। যদি কিছু ভুল ত্রুটি করে থাকি জানবেন নিজের অজান্তেই করে ফেলেছি। তাই আপনার পায়ে হাত দিয়ে শেষবারের মতো ক্ষমা ভিক্ষা করতে চাই। কি, পায়ে হাত দিতে দেবেন?

—না, কেষ্ট থাক, তোমার সঙ্গে আমার দেনা পাওনা শেষ, আমি চললাম।

কৃষ্ণভামিনী শত অনুনয়-বিনয় করেও যখন মথুরবাবুকে আটকাতে পারলো না, শুধু শূন্যে দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে কতক্ষণ। সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ায়, কী যেন ভাবতে থাকে এমন সময় পাড়ার মেয়ে মঙ্গলী মাসি মাসি বলে ডাকতে থাকে। ঘোর ভাঙতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—

—কিরে মঙ্গলী তুই; হঠাৎ কী মনে করে রে, বাঃ বাঃ কী সুন্দর লাগছেরে তোকে। খুব ভালো থেকেছিস তো। মাসি রাধা কোথায় গো? জান মাসি আমার বর আমায় নিতে এসেছে। সব্বাই বলেছিল আমার বর নাকি আর আসবে না। হোক না দেরি তবু এসেছে তো। তাই তো রাধাকে খুঁজছি, রাধা ছাড়া এ আনন্দ আর কার সঙ্গে ভাগ করে নেব বলো।

—রাধা তো নেই মনা, ওতো চলে গেছে।

—চলে গেছে, মানে?

—হ্যাঁরে মনা, রাধা চলে গেছে ওর মনের মানুষের হাত ধরে।

—ওমা! তবে তোমার কী হবে মাসি?

—ওমা! রাধা কি সারাজীবন এই বুড়িকে পাহারা দিতে এখানে পড়ে থাকবে নাকি।

—ইস্ রাধার সঙ্গে একটু দেখা হলো না খুব খারাপ লাগছে গো মাসি। তুমি রাধাকে একটু বলে দিও মাসি।

—নিশ্চয়ই দেব মনা, নিশ্চয়ই দেব। কাল দোল ভালো করে বরের সঙ্গে আবির খেলিস। খুব খুশি হোস মনা, ভালো করে সংসার করিস।

—আচ্ছা আমি এখন যাই মাসি।

—যাই বলতে নেই মনা বল আসি।

—হ্যাঁ! মাসি আসি।

—যা, যা, তোদের মঙ্গল হোক। তোরা ভালো থাকিস। এই

মঙ্গলী শোন— গগন রিক্সাওয়ালাকে দেখলে একটু বলিস তো আমি একটু ডেকেছি। বলিস রাত হলেও ক্ষতি নেই। রিক্সাটানা শেষ করে যেন একটু আসে। বলিস কিন্তু।

—হ্যাঁ, মাসি বলে দেব।

বেশ রাতের দিকে গগন কৃষ্ণভামিনীর বাড়ি আসে। লাজুক লাজুক মুখ করে হাক পাড়ে। কিন্তু কারো দেখা নেই। গগন একপা দু'পা করে দেরাজ থেকে শ্রীখোলটা তুলে নেয়, জানান দেবার জন্য তাল বাজাতে থাকে। বাজনা শুনতে পেয়ে কৃষ্ণভামিনী দ্রুত এসে পড়ে বলে—

—ও, গগন তুমি। কখন এলে।

—এই তো এক্ষুনি, কেন ডেকেছো বলো।

—গগন আমার একজন লোক দরকার। রোজগেরে লোক, যে আমার দায়িত্ব নিতে পারে। আমার সঙ্গে থাকতেও পারে।

—তা রিক্সাটা যখন চালাই, তখন রোজগার একটা আছেই কী বলো?

—এ তো শুধু থাকা নয় রাখাও বটে।

—তা তো বটেই, তবে আমায় যদি বলো তবে আমি থাকতে পারি। আজ থেকেই পারি।

—বেশ তবে তাই হোক।

—তা ডাকলে যখন, আর আমিও যখন এলুম তখন একটু হারমোনিয়ামটা ধরো না, আমি একটু প্রাণ ভরে বাজাই।

—এই মাঝ রাত্তিরে গান? শুতে যাবে না?

—কৃষ্ণভামিনীর পাশে থেকে শুধু বাজাবো এটাই তো চেয়েছি সারাটা জীবন। আর কিছুই তো চাইনি, সে কোনকালে ভগবান আমার হাতে শ্রীখোল তুলে দিয়েছিল কে জানে?

—বর্ধমানের আসরে কৃষ্ণভামিনীর গান শুনে কখন যে মজে গেলুম, তারপর থেকে শুধুই ভেবেছি কবে তোমার সঙ্গে একান্তভাবে বাজাতে পারবো। আজ যখন নিজেই ডাকলে, একটু ধরোনা তোমার বিখ্যাত সেই পূর্বরাগ-অনুরাগের সুর। আমি একটু প্রাণ ভরে বাজাই।

—গগন, কৃষ্ণভামিনী বড়ো দেরি করে ফেললো তোমায় চিনতে। সেই এলে, তো আগে কেন এলে না।

—আগে তো এভাবে কোনোদিন ডাকে না, আমি কিন্তু ডেকেছিলুম।

—বিশ্বাস করো গগন, বিশ্বাস করো, সে ডাক আমি শুনতে পাইনি। আমার দম্ভ, আমার অহংকার আমায় সে ডাক শুনতে দেয়নি।

—তা আজ তো শুনতে পেয়েছো, তাহলে আর দেরি কেন? একটু হোক না— 'কাল আসি বলে চলে গেছে কালা সে কালের কত বাকি, আমার যৌবন শিয়রে পড়িছে যে ভাঁটা কেমনে তাহারে রাখি।' কিংবা কানাইকে সেই ললিতার প্রশ্নমালা— যেমন— 'তোমার অঞ্জনের কালি বয়ানে লেগেছে কালির উপর কালো— প্রভাতে উঠিয়া এমুখ হেরিনু দিন যাবে আজি ভালো। সখি দিন আমাদের ভালো যাবে। হয়ে যাক, হয়ে যাক। কই হারমনিয়ামটা পাড়ো, আচ্ছা আমিই এনে দিচ্ছি।

গগন নিজে থেকেই হারমোনিয়ামটা পেড়ে কৃষ্ণভামিনীর সামনে রাখে। নিজের কাঁধে শ্রীখোল তুলে নেয়। বিভিন্ন তালে বাজাতে থাকে। কৃষ্ণভামিনী আর চুপ করে থাকতে পারে না। সমস্ত মান-অভিমান দম্ভ অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেন মাটিতে মিশে যায়। পরম আবেগে গগনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'চোখে নামে শ্রাবণের ধারা। গগন আদরে আদরে তার পরম প্রিয়াকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে তাকে আবিরে আবিরে রাখিয়ে দেয়। কৃষ্ণভামিনীও গগনকে লাল ফাগুয়ায় রঞ্জিত করে তোলে। তারপর হারমোনিয়ামটা ধরে গগনের সামনে বসে সুরের তুফান তোলে। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর গলায় এ কোন সুর। এতো কীর্তনের সুর নয়। এ যেন মনের 'পরে ব্যথার কাজল দিয়ে আঁকা—চাওয়া-পাওয়া, ন পাওয়ার বেদন হাহাকার। কৃষ্ণভামিনী গাইছে—

সবুজ বনের অবুঝপাখিরে কেন তুই ডাকিস ওমন করে— ও; চোখ গেল।

ও; তুই যার আশাতে কেঁদে বেড়াস সে এলে কি ঘরে ও; তোর চোখ গেল।

জেগে জেগে জেগে বিরহীর লেগে পোহাইলি কত রাত
এলো না তো জীবনের বোর জীবনের সুপ্রভাত— ওরে,
পুবদিক হতে ঊষারানি এসে দিয়ে গেছে কত আলো
খুলিল না তোর বন্ধন ভোর মোছে না বরণ কালো

তবু আকাশ ভরে আগুন জ্বালো সুরের লহরে— ও, তার চোখ গেল।

বিরহী বনের পাখিরে কেন তুই ডাকিস ওমন করে, ও, চোখ গেল।

গগন এক তৃপ্তির আনন্দে খোল বাজাতে থাকে। ওরা দুজনে এমনিভাবে সংগীত মাতোয়ারা হয়ে যায়। গান গাইতে গাইতে কৃষ্ণভামিনী আবার গগনের গালে আবির মাখিয়ে রাঙিয়ে দেয়। গগন তখন মুক্তির আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেয়ে ওঠে— বিজয় সরকারের মর্মভেদী গীতি আলেখ্য।

তুমি জানো না; তুমি জানোনারে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা
তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার মন মানো না। —তুমি জানো না...
কাষ্ঠযোগে দাবানল পোড়ায়ে দেয় বনজঙ্গল মনপোড়ানো আগুন বন্ধু তাহা না,
কত বিরহীর অন্তরতলে বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে
মনের দুঃখ মুখে বলা চলে না। তুমি জানো না...
তোমায় খুঁজি জনমে জনমে ক্ষিতি অব তেজ মরুৎ বোমে একদিনও দেখিতে বন্ধু এলে না
অধম পাগল বলে কি ও চোর আসবে কি জীবনে মোর
বুকে রইলো ব্যথা ভরা বাসনা। —তুমি জানো না...

এভাবেই ওরা জীবনের ছন্দে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
28 June - 2021 - Rs. 12.00
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021

SURYA

MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES

AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN

**SURYA ROSHNI LIMITED**
**E-mail:** consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
**Tel:** +91-11-47108000, 25810093-96 | **Toll Free No.: 1800 102 5657**


SWASTIKA DIGITAL SWASTIKA DIGITAL swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us Chandrachur Goswami :9674585214 Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা ।।